বিজ্ঞানের খেলা

অমরনাথ রায়

ওরিয়েণ্ট লংম্যান

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬০

—

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস :
৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১
আঞ্চলিক অফিস :
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০০০১
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০১৩
৩৬এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ৬০০০০২
বি-৩/৭ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১

—

মুদ্রক : শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

প্রকাশক : শ্রী এন্ ভেঙ্কু আয়্যার
আঞ্চলিক ম্যানেজার
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

—

—উৎসর্গ—

॥ বিষয় সূচী ॥

১।	রাসায়নিক বাগান	১—৩
২।	কাগজের বাক্সে জল ফোটানো	৩—৫
৩।	রং নেই, তবু রং	৫—৭
৪।	আঙুল না ভিজিয়ে জল থেকে মুদ্রা তোলা	৭—৯
৫।	পড়ন্ত বস্তুর ওজন	৯—১১
৬।	পলতেহীন বাতি	১১—১২
৭।	মোমবাতির শিখা নেভানোর যান্ত্রিক কৌশল	১৩—১৫
৮।	ধোঁয়ার কুণ্ডলী	১৫—১৬
৯।	বোতল ব্যারোমিটার	১৬—১৮
১০।	ছায়া দেখে অট্টালিকার উচ্চতা নির্ণয়	১৮
১১।	অদৃশ্য কালি	১৯—২১
১২।	কাগজের ব্যাঙের নাচন	২১—২২
১৩।	শীতল শিখা	২২—২৩
১৪।	দেশলাই বন্দুক	২৪—২৫
১৫।	ফ্যারাও-এর সাপ	২৬
১৬।	অ্যাসিড দিয়ে আগুন জ্বালা	২৭
১৭।	আলোর ফুলকি	২৮
১৮।	খেলার কামান	২৯—৩০
১৯।	কাগজের মাছের সাঁতার কাটা	৩১—৩২
২০।	টাকাটা কি ছিটকে যাবে ?	৩৩—৩৪

২১। সীসার গাছ ৩৪—৩৫
২২। আগুনে কাগজ পোড়ে না! ৩৬—৩৭
২৩। আগুন নেভাবার যন্ত্র ৩৭—৩৯
২৪। বোতলের মধ্যে মেঘ ৩৯—৪০
২৫। সহজ জল-চক্র ৪১—৪২
২৬। ফুটো পাত্রে জল ধরে রাখা ৪২—৪৩
২৭। রুপোর গাছ ৪৪
২৮। বিনা আগুনে জল ফোটানো ৪৫—৪৬
২৯। সাবানের বুদ্বুদের পেটে বুদ্বুদ ৪৬—৪৭
৩০। কাগজের ঘোড়দৌড় ৪৮—৪৯
৩১। বুমেরাং নিক্ষেপ ৪৯—৫০
৩২। ঘূর্ণায়মান খেলনা ৫১—৫২
৩৩। চামচ থেকে মধুর ঘণ্টাধ্বনি ৫২—৫৩
৩৪। সরু গলার বোতলে ডিম ঢোকানো ৫৩—৫৪
৩৫। তরলে ভাসমান ডিম ৫৫—৫৬
৩৬। জলে চলমান দেশলাই কাঠি ৫৬—৫৭
৩৭। ঘরের মাঝে রামধনু ৫৮—৫৯
৩৮। লেবু থেকে বিদ্যুৎ ৫৯—৬০
৩৯। সহজে কোল গ্যাস উৎপাদন ৬১—৬২
৪০। সূর্যালোকও কাজ করতে পারে ৬৩—৬৪
৪১। যান্ত্রিক কৌশলে জল ঢালা ৬৫—৬৬
৪২। তরল বায়ুর বিচিত্র ধর্ম ৬৭—৬৯
৪৩। তারের সাহায্যে বরফ কাটা ৭০—৭১
৪৪। কম উষ্ণতায় জল ফোটানো ৭১—৭৩

৪৫। আগুনের শিখা ও তারের জাল ৭৩—৭৫
৪৬। যে রং উবে যায় ৭৬—৭৭
৪৭। ফুটন্ত জলেও বরফ গলে না ৭৭—৭৮
৪৮। জলের কোয়ারা ৭৯—৮০
৪৯। ঘূর্ণায়মান কাগজের স্ক্রু ৮১—৮২
৫০। ডুবুরী পুতুল ৮৩—৮৪

১

রাসায়নিক বাগান

এ-বাগান সত্যিকারের বাগান নয়। এ-বাগানে মাটি নেই, আর নেই সত্যিকারের গাছপালা। তবে এ কেমন ধারা বাগান?—সেই কথাই বলব এখন।

কাচের ছোটখাটো একটা চারকোণা পাত্র নাও। ঐ পাত্রের মেঝেতে এক সেন্টিমিটার মতো পুরু ক'রে বালি বিছিয়ে দাও। আর তার ওপর বিছিয়ে দাও ছোট-বড় নানান আকারের কতকগুলো নুড়ি পাথর।

বাজার থেকে খানিকটা 'সোডিয়াম-সিলিকেট' যৌগ কিনে আন। এটা একটা রাসায়নিক পদার্থ। একে 'ওয়াটার গ্লাস'ও বলা হয়। দু' চামচ ওয়াটার গ্লাসের গুঁড়ো এক কাপ গরম জলে ফেলে চামচ দিয়ে নেড়ে দাও। ওয়াটার গ্লাসের স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ তৈরি হবে। এমনিভাবে তৈরি ওয়াটার গ্লাসের জলীয় দ্রবণ দিয়ে পাত্রটার তিন-চতুর্থাংশ ভরে ফেল। ঐ অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা ফেলে রেখে দ্রবণকে ঠাণ্ডা হতে দাও।

এবার বাজার থেকে কয়েকটি রঙিন রাসায়নিক দ্রব্যের স্ফটিক, যেমন—হরিদ্রাভ-বাদামী রঙের 'ফেরিক ক্লোরাইড'

স্ফটিক, হালকা সবুজ রঙের 'ফেরাস সালফেট' স্ফটিক, হালকা লাল রঙের 'কোবাল্ট নাইট্রেট' স্ফটিক, নীল রঙের 'কপার সালফেট' এবং সাদা রঙের 'জিঙ্ক সালফেট' স্ফটিক কিনে আন। তাঁরপর সব রঙের স্ফটিক একটি-দু'টি ক'রে ঐ কাচ-পাত্রের ওয়াটার গ্লাস দ্রবণে ফেলে দাও। পুরো একটা রাত পাত্রটিকে নাড়াচাড়া করবে না।

পরদিন সকালে উঠেই দেখবে যে—ঐ কাচপাত্রে হরেক রঙের গাছপালা গজিয়েছে এবং তা সুন্দর একটা বাগানের মতো দেখাচ্ছে।

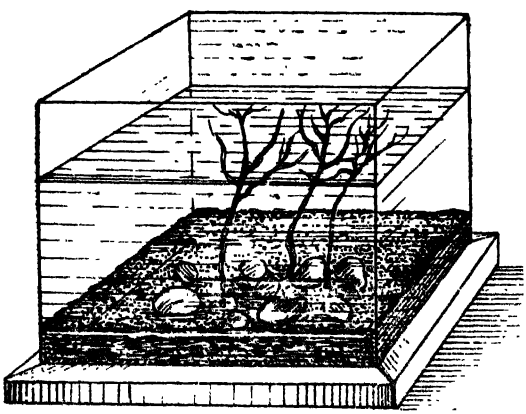

ঐ যে রঙিন গাছপালা—ওগুলো সত্যিকারের গাছপালা নয় কিন্তু। আসলে ওগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। এক রঙের রাসায়নিক দ্রব্যের একাধিক কণা একটার সঙ্গে আর

একটা যুক্ত হয়ে এক-একটি গাছের আকার লাভ করেছে। যেমন ধর, তুঁতের অর্থাৎ কপার সালফেটের স্ফটিক হচ্ছে নীল রঙের। ওয়াটার গ্লাস দ্রবণে যখন ওটা তুমি ফেললে, তখন ওটা ঐ দ্রবণের জলে মিশতে আরম্ভ করল। যতই ওটা মিশতে লাগল, ততই 'কপার সিলিকেট' ও 'সোডিয়াম সালফেট' নামক যৌগ দু'টি উৎপন্ন হতে লাগল। কপার সিলিকেট যৌগটা নীল রঙের এবং এটা জলে মেশে না। এর এক-একটি কণা উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তুঁতের স্ফটিকের ওপর জমতে লাগল। জমে জমে ডালপালাযুক্ত একটি নীল রঙের গাছের আকার ধারণ করল। অন্যান্য যৌগের স্ফটিক থেকেও এমনিভাবে এক-একটি রঙিন গাছ সৃষ্টি হলো এবং রাতারাতি গড়ে উঠল তোমার 'রাসায়নিক বাগান'।

এ-বাগান তোমার ঘরে রেখে দাও। ঘরের শোভা অনেক বেড়ে যাবে।

২

কাগজের বাক্সে জল ফোটানো

পাতলা কাগজ দিয়ে একটা বাক্স বা পাত্র তৈরি কর। ঐ পাত্রে কিছুটা জল নাও। একটি তে-পায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর তার-জালি রেখে তার ওপরে জলসুদ্ধ কাগজের পাত্রটা বসাও।

তার-জালির নীচে একটি জ্বলন্ত 'বুনসেন বাতি' অথবা 'স্পিরিট ল্যাম্প' রেখে, তার সাহায্যে কাগজের পাত্রটিতে তাপ দাও। দেখবে যে, কেটলিতে যেমন চায়ের জল ফোটে, ঐ কাগজের পাত্রের জলও তেমনিভাবে ফুটছে। জল ফুটছে অথচ কাগজের পাত্রটা পুড়ছে না। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? আশ্চর্য হবার মতোই ব্যাপার বটে, তবে এটা সত্যি। যা বলছি, সব সত্যি। বিশ্বাস না হয় তো হাতেনাতে পরীক্ষা ক'রে দেখ।

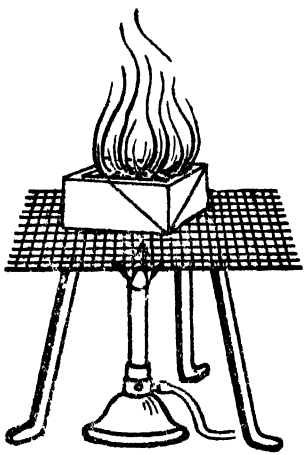

এখন বলি শোন, কিভাবে এ-ব্যাপারটা সম্ভব হয়।

তোমরা হয়তো জান যে, পাতলা কাগজ তাপের সুপরিবাহী, আর পুরু কাগজ তাপের কুপরিবাহী। তাই পাতলা কাগজের মধ্যে দিয়ে তাপ খুব তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে চলে যায়। আর সেই তাপ পেয়ে জল ক্রমশ উত্তপ্ত

হয়ে ফুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঐ সময়টুকুর মধ্যে পাতলা কাগজের বাক্সটা যথেষ্ট গরম হয় না এবং পুড়েও যায় না। তবে হ্যাঁ, পাত্রটা যদি পুরু কাগজের হতো তাহলে কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে পুড়ে যেত। কারণ, আগেই বলেছি যে পুরু কাগজ তাপের কুপরিবাহী। পুরু কাগজের বাক্স নিলে তার মধ্যে দিয়ে তাপ তাড়াতাড়ি জলে পৌঁছুতে পারত না। ইতিমধ্যে পুরু কাগজ খুব তেতে উঠে পুড়ে যেত। আর তোমার পরীক্ষাটাই হয়ে যেত বানচাল।

৩

রঙ নেই, তবু রঙ

একটা মজাদার পরীক্ষার কথা বলি। ঘরে বসে পরীক্ষাটা তোমরাও করতে পার। যন্ত্রপাতির বিশেষ প্রয়োজন নেই। সাদা কাগজ, কালি, কলম ও একটা 'পেনসিল কম্পাস' হলেই চলবে।

প্রথমে সাদা কাগজের ওপরে কালি দিয়ে একটা বৃত্ত আঁক। বৃত্তের অর্ধেক অংশে কালো কালি লেপে দাও। বৃত্তের সাদা অর্ধাংশে কালি দিয়ে ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ আঁক। আঁকাটা ঠিক যেন পরের পৃষ্ঠার ছবির মতন হয়।

ছবি আঁকা শেষ হলে কাগজখানাকে গোল ক'রে অর্থাৎ বৃত্তের আকারে কেটে নাও। সেটাকে ঐ মাপেরই একটা বৃত্তাকার কার্ডবোর্ডের চাকতির ওপর আঠা দিয়ে এঁটে দাও। চাকতির ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে সরু একটা ফুটো কর। ঐ ফুটোর

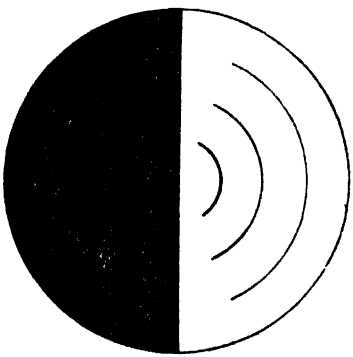

মধ্যে বড় একটা আলপিন ঢুকিয়ে দাও। তারপর আলপিনটা চেপে ধরে চাকতিটাকে চোখের সামনে ঘুরিয়ে যেতে থাক।

কী দেখতে পাচ্ছ?

বিভিন্ন রঙের কতকগুলো বৃত্তাকার রেখা দেখতে পাচ্ছ—তাই না?

এইবার চাকতিটাকে আগেরবারের বিপরীত দিকে ঘোরাতে থাক।

এবার কী দেখছ?

দেখছ, বৃত্তাকার রেখাগুলোর অবস্থানও উলটে গেছে—তাই না?

কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হলো ? রঙ নেই অথচ রঙ দেখা যাচ্ছে বলে মনে হলো কেন ?

বিজ্ঞানীরা এ-প্রশ্নের সদুত্তর আজও দিতে পারেননি। তবে এ-রঙের একটা নাম দিয়েছেন তাঁরা। এ-রঙকে তাঁরা বলেছেন—'সাব্‌জেক্‌টিভ কালার'।

৪

আঙুল না ভিজিয়ে জল থেকে মুদ্রা তোলা

বড় একটা প্লেট নাও। তার ওপর একটা পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা রাখ। এরপর প্লেটে এমনভাবে জল ঢাল, যাতে ক'রে ঐ মুদ্রাটি জলে ঢাকা পড়ে যায়।

এইবার তোমার পাশের বন্ধুটিকে বল: আঙুল না ভিজিয়ে প্লেট থেকে ঐ মুদ্রাটি তোল তো।

তোমার বন্ধুর হয়তো মনে হবে, এটা অসম্ভব ব্যাপার। আসলে কিন্তু তা নয়। একটু বুদ্ধি খাটালে সহজেই সে ও-কাজটা করতে পারবে।

বল দেখি, এর জন্যে কি করতে হবে তোমার বন্ধুকে ?

তাহলে আমিই না হয় বলে দিচ্ছি, শোন।

তোমার বন্ধুকে যোগাড় করতে হবে একটা কাচের

গেলাস ও একটা ছিপি। ছিপিটাকে মুদ্রা থেকে বেশ খানিকটা দূরে প্লেটের ওপরে রাখতে হবে। আর দু'টো দেশলাইয়ের কাঠি ঐ কর্কের ওপরে এমনভাবে গেঁথে রাখতে হবে, যাতে ক'রে দেশলাইয়ের কাঠির বারুদ-লাগানো মাথা ওপর দিকে থাকে। এরপর ছিপি-সংলগ্ন দেশলাইয়ের কাঠি দু'টিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কাচের গেলাসটা তার ওপর চাপা দিতে হবে।

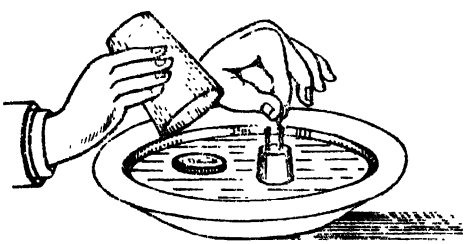

এ কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে দেখা যাবে যে, প্লেটের বেশির ভাগ জলই সরে গিয়ে জমেছে ঐ গ্লাসের ভেতরে। মুদ্রাটি কিন্তু যেখানে ছিল সেইখানেই রয়েছে। সেটার ওপর থেকে জল গেছে সরে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেই মুদ্রার গায়ে লেগে থাকা জলটুকুও যাবে উবে। তখন আঙুল না ভিজিয়ে মুদ্রাটিকে অনায়াসেই প্লেট থেকে তুলে নেওয়া যাবে।

বল দেখি, এটা কি ক'রে সম্ভব হলো?

শোন তাহলে।

জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি দু'টো গেলাসের ভেতরকার বাতাসকে গরম করল। গরম হওয়ার দরুন ঐ বাতাসের চাপ গেল বেড়ে। সেই চাপের দরুন খানিকটা বাতাস গেলাস থেকে ভুড়ভুড় ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আবার জ্বলন্ত কাঠি দু'টো নিভে যাওয়ার পর গেলাসের ভেতরকার বাতাসের চাপও কমতে লাগল। তখন বায়ুমণ্ডলের চাপে প্লেটের জল গিয়ে গেলাসের ভেতরে ঢুকল। আর গেলাসের পাশে একটু দূরেই মুদ্রাটি পড়ে রইলো জল থেকে মাথা তুলে।

৫

পড়ন্ত বস্তুর ওজন

দাঁড়িপাল্লার একটি পাল্লার ওপরে একটি জাঁতি রাখ। জাঁতির দুই বাহুর মধ্যে একটিকে সুতো দিয়ে দাঁড়ির হুকের সঙ্গে টেনে বেঁধে দাও। জাঁতির অবস্থাটা তখন কেমন হবে তা বুঝতে পারছ?

ওর একটা বাহু পড়ে থাকবে পাল্লার ওপরে। আর অপর বাহুটা পাল্লা থেকে খানিকটা ওপরে ওঠা অবস্থায় সুতো দিয়ে বাঁধা থাকবে। এই অবস্থায় অপর পাল্লায় উপযুক্ত বাটখারা রেখে জাঁতিটাকে ওজন কর। তারপর একটা

জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির সাহায্যে ঐ সুতোটাকে পুড়িয়ে দাও।

পুড়িয়ে দেবার পর কি দেখতে পাবে ?

দেখবে, জাঁতির যে বাহুটা এতক্ষণ সুতো দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিল, সেটা পাল্লার ওপরে ধপ্ ক'রে পড়ছে।

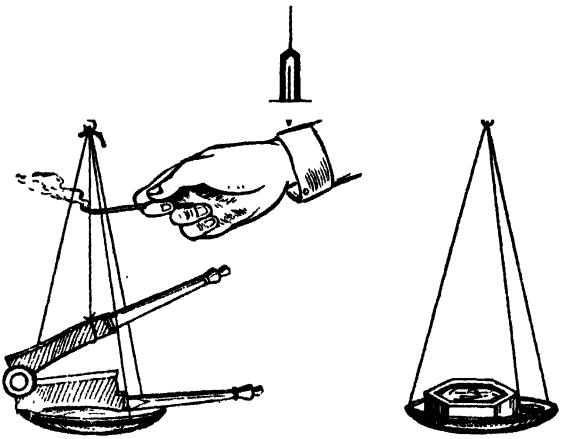

আচ্ছা, জাঁতির ঐ বাহুটা পড়ার সময় দাঁড়িপাল্লার অবস্থাটা কেমন হবে, বলতে পার ?

দাঁড়িটা তার সাম্য অবস্থা থেকে একটু ওপরে উঠবে, না নীচে নামবে কিংবা সাম্য অবস্থাতেই থাকবে ?

দেখবে যে, জাঁতি সমেত পাল্লাটা ক্ষণিকের জন্যে একটু ওপরে উঠে গেল। পরক্ষণেই আবার ফিরে এলো আগেকার সাম্যাবস্থায়।

এমনটি কেন হলো জান ?

তাহলে বলি শোন।

পড়ন্ত বস্তুর কোনো ওজনই থাকে না। জাঁতির সুতোয় বাঁধা বাহুটা যখন নীচের দিকে পড়ছিল তখন তার কোনো ওজন ছিল না। পড়ার সময় জাঁতির ওজন ক্ষণিকের জন্যে কমে গিয়েছিল। আর সেই কারণে দাঁড়িটাও ক্ষণিকের জন্যে ওপর দিকে উঠেছিল।

৬

পলতেহীন বাতি

লণ্ঠন, কেরোসিন তেলের কুপি, প্রদীপ, মোমবাতি, স্পিরিট ল্যাম্প—এ সব বাতিতেই তো পলতে আছে, তাই না? কিন্তু পলতেহীন বাতির কথা শুনেছ কি কখনও?

তোমরা সহজেই কিন্তু পলতেহীন বাতি তৈরি ক'রে নিতে পার। কেমন ক'রে, এইবার তা বলি।

একটা টেস্ট টিউব যোগাড় কর। তার খোলা মুখে বেশ চেপে একটা কর্ক বসাও। ঐ কর্কের ঠিক মাঝখানটিতে একটা ফুটো কর। সেই ফুটোর মধ্যে ছোট একটা কাচনল বসিয়ে দাও। কর্কের নীচে কাচনলটির খুব সামান্য অংশই যেন বেরিয়ে থাকে। আর কর্কের ওপরে কাচনলটি আড়াই সেন্টিমিটার মতন বেরিয়ে থাকলেই চলবে।

টেস্ট টিউবে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ভরে দাও। তারপর কাচের নল সমেত কর্কটা তার মুখে এঁটে বসিয়ে দাও। এ অবস্থায় টেস্ট টিউবটাকে ফুটন্ত জলভরা একটা পাত্রে আংশিক ডুবিয়ে রাখ।

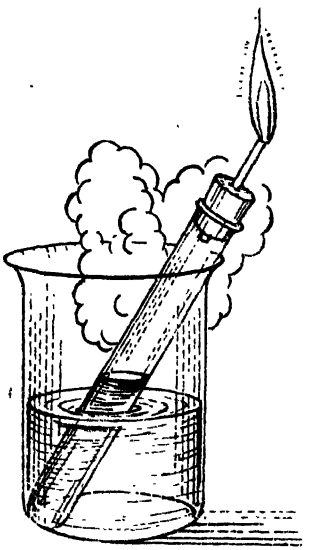

ফুটন্ত জলের তাপ পেয়ে স্পিরিট বাষ্পে পরিণত হবে। সেই বাষ্প কাচনলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকবে। তখন কাচনলের খোলা মুখে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধরলে দেখবে, নলের মুখে ঐ বাষ্প দিব্যি জ্বলছে। টেস্ট টিউবে যতক্ষণ স্পিরিট থাকবে, তোমার পলতেহীন বাতিও ততক্ষণ জ্বলবে।

৭

মোমবাতির শিখা নেভানোর যান্ত্রিক কৌশল

কথাটা শুনে তোমরা হয়তো একটু অবাক হবে, সন্দেহ নেই। ফুঁ দিয়েই তো অনায়াসে বাতি নেভানো যায়। তার জন্যে আবার যান্ত্রিক কৌশলের দরকার কি? কিন্তু বাতি নেভাবার প্রয়োজনের জন্যেই এই ব্যবস্থার কথা বলছি না। সেটা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো—এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটানো।

ত্রিশ সেন্টিমিটার মতন লম্বা একটু মোটা তামার তার যোগাড় কর। আড়াই সেন্টিমিটার মতো মোটা একটা গোলাকার লাঠির গায়ে তারটাকে লম্বা স্প্রিংয়ের মতো এক-ফেরতা ক'রে জড়িয়ে দাও। তারের এক প্রান্ত একটু লম্বা ক'রে একটা লোহার দণ্ড বা ঐ রকমের আর একটা কিছুর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ।

এবার একটা মোমবাতি জ্বাল। বাতিটা কিছুক্ষণ জ্বলবার পর স্প্রিংয়ের মতো সেই তারের কুণ্ডলীটাকে বাতির শিখার

ওপর এমনভাবে ঝুলিয়ে দাও, যাতে সেটা শিখা স্পর্শ না ক'রে বাতিটার মুখ অবধি ঘিরে থাকে। ছবিটা দেখে নাও।

তারের কুণ্ডলীটাকে এইভাবে ঝুলিয়ে রাখবার পর দেখবে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাতির শিখাটা নিভে গেল।

কেন এমন হয়, বলতে পার?

কারণটা কিন্তু তেমন কিছুই নয়। তামার তার তাপের সুপরিবাহী। তাই তামার তার খুব তাড়াতাড়ি বাতির শিখার উত্তাপ শুষে নেয়। কাজেই তাপের অভাবে বাতির মোম তখন আর গলতে পারে না। তার ফলে বাতির শিখাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিভে যায়।

৮

ধোঁয়ার কুণ্ডলী

এক-মুখ খোলা একটু লম্বা আকারের একটা টিনের কৌটো যোগাড় কর। কৌটোটার ভেতর ও বাইরে বেশ ভালো ক'রে জলে ধুয়ে রোদে ফেলে শুকিয়ে নাও। তারপর তার

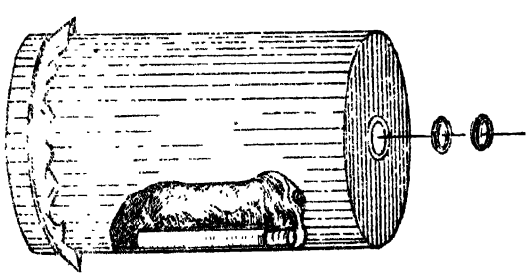

তলার দিকের বন্ধ মুখটার ঠিক মাঝখানে আধ ইঞ্চি আন্দাজ ব্যাসযুক্ত একটা ফুটো কর। কৌটোর খোলা মুখে শক্ত অথচ

পাতলা একখণ্ড কাগজ মুড়ে কৌটোর গায়ের সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দাও।

এইবার ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে একটা জ্বলন্ত সিগারেট কৌটোর মধ্যে ফেলে দাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কৌটোটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে যাবে। তখন কৌটোর মুখের কাগজখানার ওপর আঙুল দিয়ে চাপ দাও। দেখবে যে, প্রতিটি চাপের পর ঐ ফুটো দিয়ে এক-একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাইরে বেরিয়ে আসছে।

৯

বোতল ব্যারোমিটার

'ব্যারোমিটার' কি তা জান তো?

ব্যারোমিটার হলো বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্র।

অতি সহজেই একটা সাদামাটা ব্যারোমিটার তোমরা ঘরে বসেই তৈরি করতে পার। কিন্তু কি ক'রে পারবে, এবার তাই বলছি।

ছোট মুখযুক্ত একটা লম্বা বোতল যোগাড় কর। আর যোগাড় কর কানা-উঁচু একটা পাত্র ও একফালি লম্বা সাদা কাগজ।

ঐ সাদা কাগজের টুকরোর গায়ে স্কেলের মতো দাগ

কেটে নাও। দাগগুলোকে 1, 2, 3 প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত কর। স্কেল আঁকা ঐ কাগজটাকে বোতলের গায়ে আঠা দিয়ে আটকে দাও। এমনভাবে আটকাও যাতে স্কেলের প্রথম সংখ্যা বোতলের গলার দিকে থাকে।

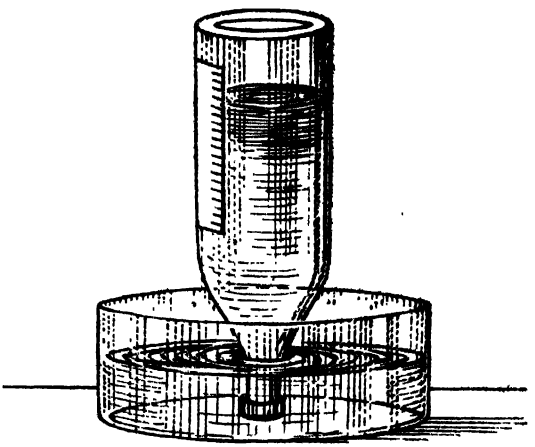

ঐ বোতলটার তিন-চতুর্থাংশ জল দিয়ে ভর্তি কর। তারপর কানা-উঁচু পাত্রটায় খানিকটা জল ঢেলে তাতে জল-ভরা বোতলটাকে উলটে খাড়াভাবে বসিয়ে দাও। তৈরি হয়ে যাবে 'বোতল ব্যারোমিটার'।

বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জলের তলও সামান্য ওঠা-নামা করবে। বোতলের

জলের তল কতটা উঠল বা নামল, তা জানতে পারবে বোতলের গায়ের স্কেল থেকে।

বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে বোতলের জল স্কেলের কোন্ দাগে দাঁড়ায় তা আগে দেখে ঠিক ক'রে রেখো। তাহলেই পরে বায়ুর চাপ কতটা কমল বা বাড়ল, তা জানতে পারবে বোতলের জল স্কেলের গায়ে কতটা উঠল বা নামল তা দেখে। বায়ুর চাপ কমলে বুঝবে যে শীঘ্রই ঝড়-জল হবে। আর বায়ুর চাপ বাড়লে বুঝবে যে আবহাওয়া ভালো থাকবে।

তবে বোতল-ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ সঠিকভাবে মাপা যায় না—কতকটা আন্দাজ করা যায় মাত্র।

১০

ছায়া দেখে অট্টালিকার উচ্চতা নির্ণয়

দিনের বেলায় যে কোনো সময়ে কোনো অট্টালিকার ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে রাখ। তারপর দু'-তিন হাত লম্বা একটা সোজা দণ্ডকে মাটির ওপর খাড়াভাবে রেখে ঐ দণ্ডের ছায়াও মেপে রাখ। মেপে রাখ দণ্ডটির দৈর্ঘ্যও।

সব কয়টি মাপ-জোক শেষ হলে অট্টালিকার ছায়ার মাপকে দণ্ডের দৈর্ঘ্য দিয়ে গুণ ক'রে গুণফলকে দণ্ডের ছায়ার মাপ দিয়ে ভাগ দাও। তাহলেই অট্টালিকার উচ্চতা পেয়ে যাবে।

১১

অদৃশ্য কালি

অদৃশ্য কালি! নামটা শুনে তোমরা হয়তো খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ—তাই না?

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিচ্ছু নেই। অদৃশ্য কালি সত্যিই আছে। কেমন ক'রে বিভিন্ন রঙের অদৃশ্য কালি তৈরি করতে হয়, সেই কথাই এখন তোমাদের বলব।

(ক) নীল রঙের অদৃশ্য কালি

'কোবাল্ট ক্লোরাইড' নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ আছে। তারই কয়েকটা দানা একটা বাটিতে রেখে অল্প জলে গুলে নাও। এখন কোবাল্ট ক্লোরাইডের দ্রবণের মধ্যে পরিষ্কার নিব-যুক্ত একটা কলম ডুবিয়ে এক টুকরো সাদা কাগজে কিছু লেখ। দেখবে, কাগজের ওপরে লেখার কোনো রঙীন রেখা পড়েনি।

এইবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তারই শিখায় ঐ কাগজটাকে ধরে সামান্য তাপ দাও। দেখবে, যে-লেখা এতক্ষণ অদৃশ্য ছিল, তা হঠাৎ নীল রঙ ধারণ ক'রে সাদা কাগজের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাপ দিতে গিয়ে কাগজখানাকে পুড়িয়ে ফেলো না যেন। তাহলে সব মাটি হয়ে যাবে কিন্তু। কাগজটা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নীল রঙের লেখাগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু কাগজে তাপ দিলে আবার লেখাগুলো ফুটে উঠবে।

(খ) কালো রঙের অদৃশ্য কালি

'আয়রন সালফেট' নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ কিনে আন। এর দ্রবণ দিয়ে সাদা কাগজে লিখলে সে-লেখা অদৃশ্য হয়েই থাকবে। কিন্তু সেই অদৃশ্য লেখার ওপরে 'পাইরো-গ্যালিক অ্যাসিড' পাতলা ক'রে বুলিয়ে দিলে কালো রঙের সুন্দর লেখা ফুটে উঠবে।

(গ) গোলাপী রঙের অদৃশ্য কালি

কিছু 'পটাসিয়াম নাইট্রেট' কিনে আন। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি কিছু খাঁটি 'অ্যাসেটিক অ্যাসিড' অথবা 'ভিনিগারে' গুলে নাও। সেই দ্রবণ দিয়ে সাদা কাগজে লেখ। যা খুশি তাই লেখ। লেখা অদৃশ্য হয়েই থাকবে। কিন্তু কাগজটাকে সামান্য তাপ দিলেই গোলাপী রঙ ধারণ ক'রে লেখাগুলো ফুটে উঠবে। কাগজটা ঠাণ্ডা হলেই আবার লেখাগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে কিন্তু।

(ঘ) বাদামী রঙের অদৃশ্য কালি

কিছুটা 'সিলভার নাইট্রেট'-এর দ্রবণ প্রস্তুত কর। দ্রবণ যেন খুব লঘু হয়। কাগজে ঐ দ্রবণ দিয়ে কিছু লেখ। সে-লেখা দেখতে পাবে না। এরপর ঐ কাগজটাকে রোদে

ফেলে রাখ অথবা গরম কর। দেখবে যে, অদৃশ্য লেখাগুলো এখন বাদামী রঙ ধারণ ক'রে ফুটে উঠেছে।

১২
কাগজের ব্যাঙের নাচন

বেশ মোটা মোটা দু'খানা বই যোগাড় কর। টেবিলের ওপর পরস্পরের থেকে কিছু দূরে বই দু'খানাকে পাশাপাশি রাখ। একখানা চওড়া কাচের পাত ঐ বই দু'খানার ওপর রাখ। এইবার ব্যাঙের আকারে কয়েকটা পাতলা কাগজ কাট। কাগজের ব্যাঙ যেন খুব ছোট ও বেশ হালকা হয়। কাগজের ব্যাঙগুলোকে কাচের পাতখানার নীচে রাখ।

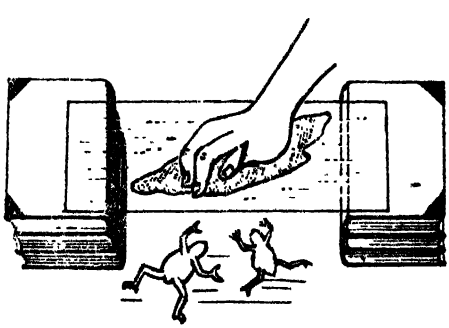

এইবার কাচখানার ওপরতলাটা রেশমী কাপড় দিয়ে কিছুক্ষণ ঘষতে থাক। দেখবে যে কাগজের ব্যাঙগুলো

লাফালাফি শুরু ক'রে দিয়েছে। রেশমী কাপড় দিয়ে ঘষার ফলে কাচখানা তড়িতাবিষ্ট হয়েছে। আর তড়িতাবিষ্ট কাচ আকর্ষণ করছে ঐ হালকা ব্যাঙগুলোকে।

পরীক্ষা শুরু করার আগে কাচখানা, রেশমী কাপড়টা ও কাগজের ব্যাঙগুলোকে বেশ ক'রে রোদে শুকিয়ে বা গরম ক'রে নিতে হয়। নইলে পরীক্ষা সফল হবে না কিন্তু।

১৩
শীতল শিখা

মোমবাতির শিখা বা প্রদীপের শিখায় আঙুল দাও। বেশ গরম মনে হবে। বেশীক্ষণ আঙুল রাখলে আঙুল পুড়েও যাবে। কিন্তু রসায়নাগারে বসে তুমি এমন শিখা উৎপন্ন করতে পার, যাতে কোনো উত্তাপ নেই। সে শিখায় আঙুল পোড়ে না। দেশলাইয়ের কাঠি, এমন কি কাগজও জ্বলে না। এরই নাম 'শীতল শিখা'।

ঘরে বসে শীতল শিখা উৎপাদন করতে পারবে না। কারণ এর জন্যে এমন কয়েকটা জিনিস দরকার হয়, যা ঘরে বসে পাওয়া বা তৈরি করা সহজ নয়। তাই রসায়নাগারে গিয়ে পরীক্ষা করাটাই সহজতর উপায়।

একটা বড় ফ্লাস্কে কিছু সাদা ফসফরাস নিয়ে 'কাচের উল'

দিয়ে তা ভালোভাবে ঢেকে রাখ। ফ্লাস্কের মুখে কর্কের মধ্যে দিয়ে একটি বাঁকা এবং একটি সোজা কাচনল লাগাও। বাঁকা নলটি যেন ফ্লাস্কের তলা পর্যন্ত পৌঁছোয়। আর সোজা নলটির একপ্রান্ত যেন কর্কের একটু ওপরে এবং অপর প্রান্ত কর্কের একটু নীচে বেরিয়ে থাকে।

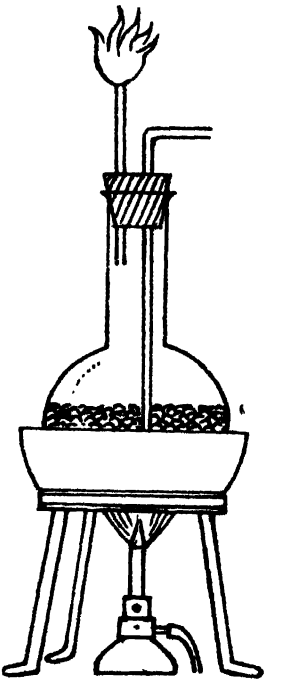

বাঁকা নল দিয়ে ফ্লাস্কের মধ্যে 'কার্বন ডাই-অক্সাইড' গ্যাস ভর। ঐ গ্যাসের সাহায্যে ফ্লাস্কের মধ্যেকার বাতাস তাড়িয়ে দাও। তার-পর ফ্লাস্কটিকে 'ওয়াটার বাথ'-এর ওপর বসিয়ে সামান্য গরম কর। দেখবে যে, খাটো নলের মুখে সবুজাভ আলো দিয়ে একটা শিখা জ্বলছে। ঐ শিখাই 'শীতল শিখা'।

১৪

দেশলাই বন্দুক

কর্ক-আঁটা মুখবিশিষ্ট একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। বোতলের মুখের ছিপিটা খুলে তার ভেতরের মুখে সমকোণে বাঁকানো একটা কাঁটা আটকে দাও। তিন-চারটে দেশলাই

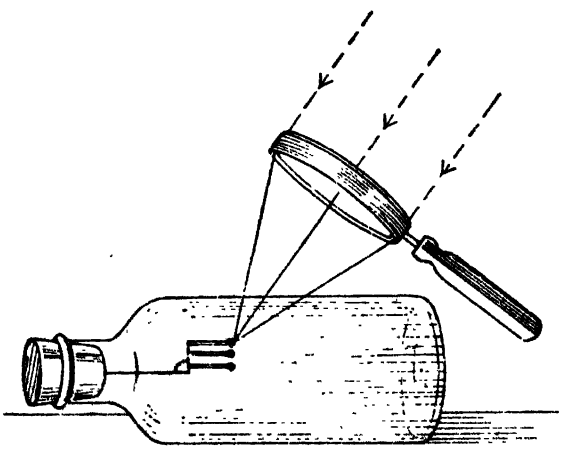

কাঠি ঐ কাঁটার বাঁকে ফুটিয়ে দাও। কাঠিগুলো যেন বোতলের মধ্যে থাকে। আর সেগুলোর মুখের বারুদ যেন এক জায়গায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে। দেশলাইয়ের কাঠি এবং ঐ বাঁকানো কাঁটাসমেত কর্কটাকে এইবার বোতলের মুখে এঁটে দাও।

এখন বোতলটাকে রোদের মধ্যে শুইয়ে রাখ। সূর্যের আলোয় একটা 'আতস কাচ' এমনভাবে ধর যাতে সূর্যরশ্মি সংহত হয়ে দেশলাই কাঠির বারুদের গায়ে পড়ে।

একটি বিন্দুতে জড়ো হওয়া ঐ সূর্যরশ্মি থেকে তাপ পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেশলাই কাঠির বারুদ জ্বলে উঠবে। জ্বলন্ত বারুদের আগুনের উত্তাপে বোতলের ভিতরের বাতাস প্রসারিত হবে। প্রসারিত সেই বাতাসের আচমকা চাপে বোতলের মুখের ছিপিটা বন্দুকের মতো আওয়াজ ক'রে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে।

১৫

ফ্যারাও-এর সাপ

দোকান থেকে কিছুটা 'মারকিউরিক থায়োসায়ানেট' কিনে আন। তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গামের আঠা মেশাও।

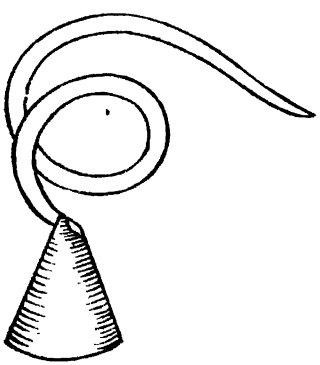

মিশ্রণকে বেশ ভালো ক'রে মেখে নাও। ঐ আঠালো মিশ্রণকে এবার দু' হাত দিয়ে পাকিয়ে লম্বা কর। আর ঐ লম্বা পাকানো অংশ থেকে ছোট ছোট টুকরো কেটে নিয়ে বড়ি বানাও। বড়িগুলো রোদে শুকিয়ে নাও।

এক-একটা বড়ি মাটিতে রেখে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও। দেখবে, পদার্থটি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ছাই সৃষ্টি হচ্ছে, তা এঁকেবেঁকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। এই স্ফীত কুণ্ডলীটাই হচ্ছে 'ফ্যারাও-এর সাপ'।

১৬

অ্যাসিড দিয়ে আগুন জ্বালা

কিছুটা 'পটাসিয়াম ক্লোরেটে'র গুঁড়ো কিনে আন। এক চামচ চিনির সঙ্গে এক চামচ ঐ গুঁড়ো মেশাও। সেই মিশ্রণকে অ্যাসবেস্টস্ লেপা তার-জালির ওপরে রাখ।

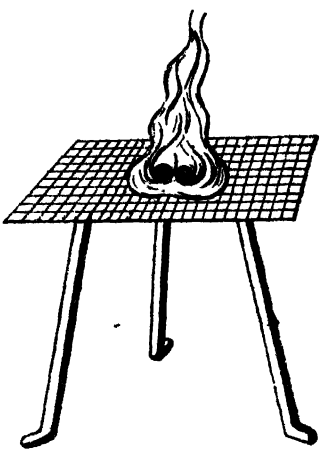

একটা কাচদণ্ডের সাহায্যে তার ওপর কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফেল। দেখবে, মুহূর্তের মধ্যেই মিশ্রণটি দাউ দাউ করে গাঢ় লাল রঙের শিখায় জ্বলে উঠেছে।

১৭

আলোর ফুল্‌কি

আধ চামচ অ্যাল্‌মিনিয়ম চূর্ণের সঙ্গে আধ চামচ আয়োডিন চূর্ণ ভালোভাবে মেশাও। এই মিশ্রণকে ভালোভাবে শুকনো একটা বোতলে ঢাল। বোতলটিকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকানো তার-জালির ওপর বসাও। তারপর বোতলের মধ্যে আট-দশ ফোঁটা জল ফেলে মিশ্রণটিকে ভেজাও এবং বোতলটিকে বার-কয়েক ঝাঁকিয়ে রেখে দাও।

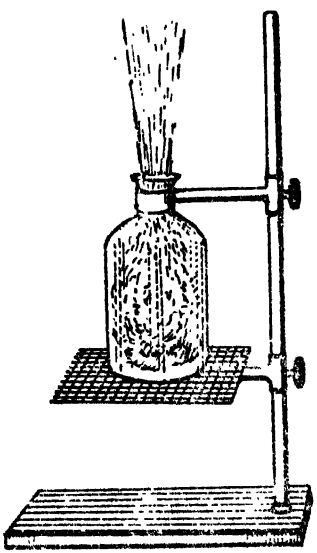

দেখবে, কিছুক্ষণ বাদেই বোতলটি বেগুনী রঙের ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে এবং তার মধ্যে মাঝে মাঝে আলোর ফুল্‌কি ঝিলিক মেরে উঠছে।

১৮

খেলার কামান

বড় একটা কাচের বোতল নাও এবং বোতলটির এক-চতুর্থাংশ জল দিয়ে ভর্তি কর। বোতলের ভিতরের ঐ জলে কিছু সোডা ও পটাশ ফেলে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোডা ও পটাশ জলে মিশে যাবে।

এবার এক টুকরো কাগজের মধ্যে 'টারটারিক অ্যাসিডে'র কয়েকটা দানা রেখে কাগজটিকে ভালো ক'রে মুড়ে ফেল। কাগজের ঐ মোড়কটিকে একটা লম্বা ও সরু তারের এক প্রান্তে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখ। ছিপির যে দিকটা বোতলের মধ্যে থাকে, সেই দিকে ঐ তারের অপর প্রান্ত আলগাভাবে আটকে দাও এবং ছিপিটাকে বোতলের মুখে এঁটে দাও। আর বোতলটাকে টেবিলের ওপর কাৎ ক'রে শুইয়ে রাখ। লক্ষ্য রাখবে, কাগজের মোড়কটি যেন জলের মধ্যে ডুবে থাকে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে, বোতলের মুখে আঁটা ছিপিটা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হঠাৎ সশব্দে দূরে ছিটকে গেল। এর কারণ কি জান?

কারণ আর কিছুই নয়, কারণ হচ্ছে—সোডা ও পটাশ-গোলা জলে টারটারিক অ্যাসিড মিশলে আস্তে আস্তে

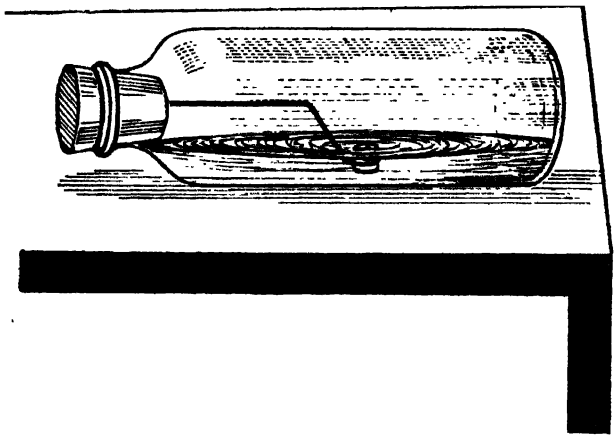

'কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস' উৎপন্ন হতে থাকে। বোতলের মধ্যে ঐ গ্যাসের চাপ যখন খুব বেশি হয়ে ওঠে, তখনই ছিপিটি সশব্দে দূরে ছিটকে যায়।

১৯

কাগজের মাছের সাঁতার কাটা

জ্যান্ত মাছ নয়—কাগজের মাছ। চৌবাচ্চার জলে ফেলে তাকে দিয়ে সাঁতারও কাটানো যায়। কিভাবে—তাই বলি শোনো।

পুরু অথচ মসৃণ একখণ্ড কাগজ নাও। পেনসিল দিয়ে তার ওপর একটা মাছ আঁক। এইবার পেনসিলের দাগ

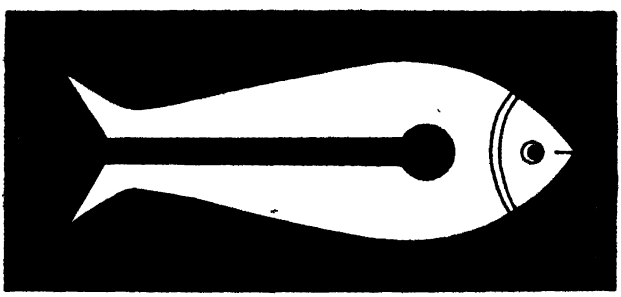

বরাবর কাগজটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল। তৈরি হয়ে গেল 'কাগজের মাছ'।

এই কাগজের মাছের বুকের মাঝখানটায় একটা গোলাকার ছিদ্র কর। ঐ ছিদ্র থেকে মাছের লেজের শেষ

অবধি সরু নালীর মতো ক'রে একফালি কাগজ কেটে ফেল।

মাছটাকে এইবার একটা চৌবাচ্চার জলে আস্তে আস্তে ভাসিয়ে দাও। চৌবাচ্চার জল যেন বেশ পরিষ্কার থাকে। জলের ওপর ভাসমান কোনো ময়লা থাকলে তোমার পরীক্ষাটা কিন্তু ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

যাই হোক, জলে ভাসমান মাছটার বুকের মাঝের ঐ গোল ছিদ্রটার মধ্যে এইবার এক ফোঁটা তেল ফেলে দাও। দেখবে, কাগজের মাছটা ধীরে ধীরে সামনের দিকে সাঁত্‌রে চলতে শুরু করেছে।

জলের চেয়ে তেল হালকা। তাই তেল জলের ওপরে ভাসে। জলের ওপরতলের তল-টানের জন্যে তেল জলের ওপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে চায়। মাছের বুকের মাঝের গোলাকার ছিদ্রটা তেমন বড় জায়গা নয়। তেলটা ওখানে ছড়িয়ে পড়বার তেমন সুবিধেও পায় না। তাই তেল তখন নালার মতো পথ বেয়ে লেজ বরাবর সোজা বেরিয়ে যায়। জলের ওপরে তেলের এই পেছন দিকে দৌড়ানোর ধাক্কায় কাগজের মাছটা সামনের দিকে গতি পায়। তাই সে সাঁত্‌রে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

২০

টাকাটা কি ছিটকে যাবে ?

বাঁ হাতের তর্জনীর ওপর একটা তাস রাখ। ঐ তাসের ওপর একটা টাকা রাখ। এক টাকার নোট নয় কিন্তু, এক টাকার মুদ্রা রাখ। ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঐ তাসের এক কোণে

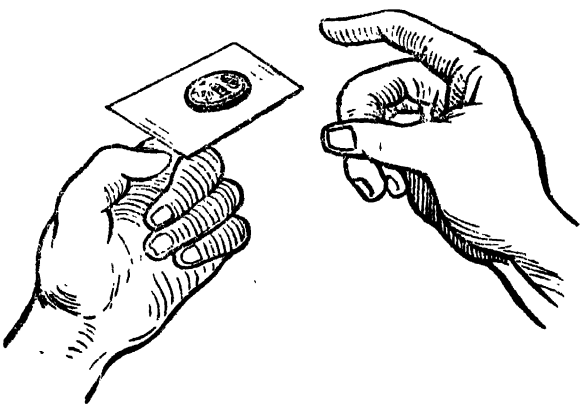

সজোরে একটি টোকা মার—যাতে ক'রে তাসটা সমান্তরাল-ভাবে ছিটকে যায়।

ঠিকমতো টোকা মারতে পারলে দেখতে পাবে যে, তাসটা

আঙুলের ওপর থেকে সত্যিই ছিটকে বেরিয়ে গেল। আর আঙুলের ওপর পড়ে রইল মুদ্রাটা।

কেন এমন হলো বল তো?

এটা সম্ভব হলো টাকার 'স্থিতির জাড্যে'র জন্যে। যে বস্তু স্থির হয়ে আছে, সে অনন্তকাল স্থির হয়েই থাকবে—যদি না বাইরে থেকে তার ওপর কোনো বল প্রযুক্ত হয়। বস্তুর স্থির হয়ে থাকার এই ধর্মের নাম 'স্থিতির জাড্য'।

টোকা মেরে তাসটাকে গতিশীল ক'রে তো তুমি দূরে ছিটকে ফেলে দিলে। কিন্তু তাসের ওপর যে টাকাটা ছিল, সেটা তার 'স্থিতির জাড্যে'র জন্যে যথাস্থানেই রয়ে গেল, কারণ তার ওপর তো কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি।

২১
সীসার গাছ

পেট মোটা একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। আর যোগাড় কর পরিষ্কার একটা জিঙ্ক দণ্ড। বোতলটাকে বেশ ভালো ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নাও। দোকান থেকে খানিকটা 'লেড অ্যাসিটেট' যৌগ কিনে আন।

আধ বোতল জলে সাত গ্রাম আন্দাজ 'লেড অ্যাসিটেট' গুলে নাও। দ্রবণটা যদি ঘোলাটে হয় তাহলে স্বচ্ছ দ্রবণ না

পাওয়া পর্যন্ত কিছু সময় অপেক্ষা কর। নইলে ঐ ঘোলা দ্রবণে সামান্য লঘু 'অ্যাসেটিক অ্যাসিড' ঢাল। স্বচ্ছ দ্রবণ পাবে।

এইবার জিঙ্ক দণ্ডটাকে একটা মোটা সুতোর সাহায্যে বেঁধে বোতলের খোলা মুখের ওপরে রাখা কাচ-দণ্ড থেকে দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। এমনভাবে ডোবাও যাতে ক'রে জিঙ্ক দণ্ডের মাত্র অর্ধেকটা অংশ দ্রবণে ডুবে থাকে।

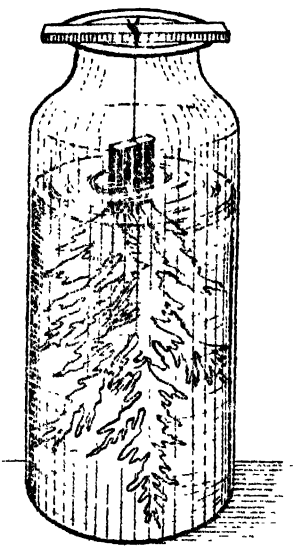

এই অবস্থায় বোতলটাকে নাড়াচাড়া না ক'রে ছয়-সাত ঘণ্টা রেখে দাও। দেখবে, দ্রবণের মধ্যে ডোবা জিঙ্ক দণ্ডটার গা থেকে ফার্নের মতো ডালপালাযুক্ত কেমন সুন্দর সীসার গাছ গজিয়েছে।

২২

আগুনে কাগজ পোড়ে না!

পোস্টকার্ডের মতো পুরু একখণ্ড কাগজ যোগাড় কর। আর যোগাড় কর একটা রুপোর টাকা। টাকাটাকে কাগজের ওপর রেখে কাগজটাকে একটা স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার

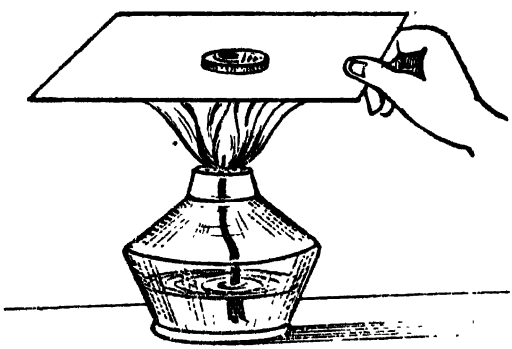

ওপরে ধর। এমনভাবে ধর, যাতে কাগজে আগুন না লাগে, অথচ কাগজটা উত্তপ্ত হয়।

স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার ওপর কাগজখানাকে কিছুক্ষণ

ধরে রাখার পর দেখতে পাবে যে, টাকার চারধারের কাগজ তাপে পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

শিখার ওপর থেকে কাগজখানাকে সরিয়ে টাকাটা তুলে নাও। এবার দেখতে পাবে, টাকার তলার অংশের কাগজ সাদাই রয়েছে—পুড়ে একটুও কালো হয়নি।

এর কারণ কি জান ?

কারণ, টাকার তলার কাগজে যতটুকু তাপ লেগেছে, তার সবটুকুই টেনে নিয়েছে ঐ রুপোর টাকাটা। ধাতুর মধ্যে দিয়ে তাপ খুব তাড়াতাড়ি সঞ্চালিত হয়। তাই ধাতব টাকা তাপ টেনে নেওয়ার দরুন তার তলার অংশের কাগজটুকু পুড়ে কালো হতে পারেনি। তবে হ্যাঁ, কাগজটাকে টাকাসুদ্ধ বেশীক্ষণ শিখার ওপর রাখলে গোটা কাগজটাই সমানভাবে পুড়ে যেত। কারণ টাকাটা যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়ার পর তাপ আর টানতে পারত না। তখন টাকার তলার অংশের কাগজ-টুকুও অন্যান্য অংশের মতই পুড়ে কালো হয়ে যেত।

২৩

আগুন নেভাবার যন্ত্র

একটা খালি কালির দোয়াত যোগাড় কর। দোয়াতটাকে বেশ ভালো ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নাও। দোয়াতের

অর্ধেকটা 'সোডিয়াম বাই কার্বনেট' নামক ক্ষারের দ্রবণ দিয়ে ভর্তি কর। কাচের ছোট একটা 'টেস্ট টিউব' বা 'পরখ-নল' নিয়ে তার অর্ধেকটা 'সালফিউরিক অ্যাসিড' দিয়ে ভর। অ্যাসিড সমেত ঐ পরখ-নলটাকে দোয়াতের ভিতরের দ্রবণে আস্তে আস্তে খাড়াভাবে ভাসিয়ে দাও। এরপর ঐ দোয়াতের মুখে একটা কর্ক আঁট। ঐ কর্ক ফুটো করে সমকোণে বাঁকানো একটা কাচনল লাগাও। কাচনলের একপ্রান্ত কর্কের নীচের দিকে যেন একটুখানি মাত্র বেরিয়ে থাকে।

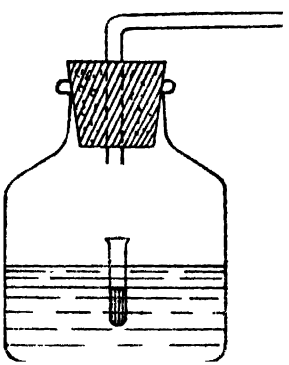

যন্ত্রটিকে চালু করবার দরকার হলে দোয়াতটিকে এই অবস্থায় বেশ ভালো ক'রে ঝাঁকাও। ঝাঁকালেই টেস্ট টিউবের অ্যাসিড মিশে যাবে 'সোডিয়াম বাই কার্বনেট' দ্রবণের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড ও ক্ষারের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে উৎপন্ন হবে 'কার্বন ডাই-অক্সাইড' গ্যাস। যে বস্তুতে আগুন

লেগেছে সেই বস্তু থেকে একটু ওপরে গ্যাস বেরুবার নলটা ধরে থাক। 'কার্বন ডাই অক্সাইড' গ্যাস জ্বলন্ত বস্তুর গায়ে ক্রমাগত লাগবে। জ্বলন্ত বস্তুটা তখন বাতাসের সংস্পর্শ-শূন্য হয়ে পড়বে। ফলে আগুনও যাবে নিভে। 'কার্বন ডাই-অক্সাইড' গ্যাস যে দহনে সহায়তা করে না—এটা তার প্রমাণ।

২৪
বোতলের মধ্যে মেঘ

মেঘ তো আকাশে থাকে। কিন্তু ঘরে বসে একটা বোতলের মধ্যেই তোমরা মেঘ সৃষ্টি করতে পার ইচ্ছে করলে। কি ভাবে, তা বলি।

বড় একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। তার মুখে একটা রবারের ছিপি আটকাও। ছিপির মাঝে একটা ফুটো করে দশ সেন্টিমিটার লম্বা একটা কাচনল লাগাও।

ছিপি খুলে বোতলের এক-পঞ্চমাংশ গরম জল দিয়ে ভর। বোতলের মধ্যে খড়িমাটির কিছু সূক্ষ্ম গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও। এখন এক টুকরো সরু রবার নলের সাহায্যে ছিপির মুখের কাচনলটাকে একটা বাইসাইকেল পাম্পের সঙ্গে যুক্ত কর। বোতলের মুখে ছিপিটা শক্ত ক'রে চেপে বসাও এবং পাম্পের হাতলটাকে কয়েকবার টেনে ধর আর ঠেলতে থাক।

পাম্প করে বোতলের মধ্যেকার বাতাসকে যখন খুব সংকুচিত করা হবে তখন সে বাতাসের চাপ খুব বেড়ে যাবে। সেই চাপে বোতলের ছিপিটা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে যাবে। আর তখনই বোতলের মধ্যে মেঘ সৃষ্টি হতে দেখবে।

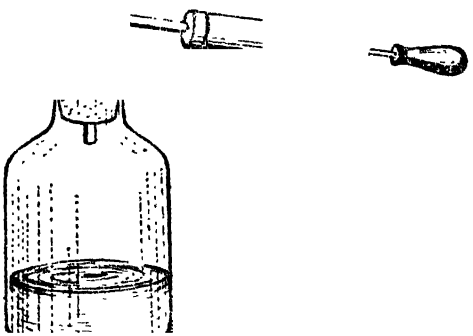

এখন শোনো, কি ভাবে এই মেঘ সৃষ্টি হলো। ছিপিটা খুলে যাওয়াতে বোতলের মধ্যেকার বাতাস প্রসারিত হলো। এই প্রসারণের ফলে সে বাতাস ঠাণ্ডাও হলো। তখন বোতলের মধ্যেকার উষ্ণতা বাতাসের শিশিরাঙ্কের নীচে নেমে গেল। আর তখনই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে বোতলের মধ্যে সৃষ্টি করল মেঘ।

প্রথমবারের পরীক্ষায় যদি ভালো মেঘ সৃষ্টি না হয়, তবে বোতলের জলে কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল মিশিয়ে পরীক্ষাটা আবার কর। এবারে কৃতকার্য হবেই।

২৫

সহজ জল-চক্র

বেশ বড় একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। বোতলের

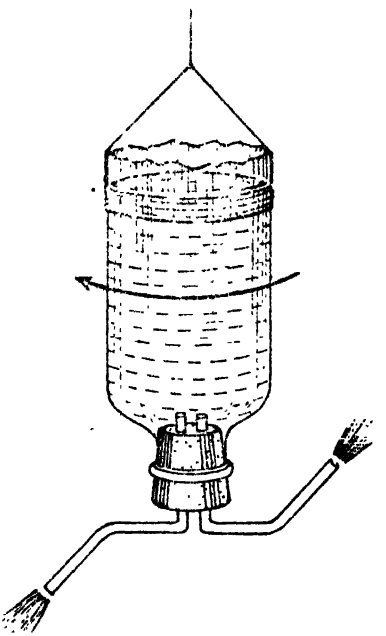

তলার অংশটা সাবধানে ভেঙে ফেল। ভাঙা অংশের চারপাশে

মজবুত সুতো কয়েকফেরতা ক'রে জড়াও। তারপর ছবিতে দেখানো উপায়ে বোতলটাকে ঐ সুতোর সাহায্যে ঝুলিয়ে দাও।

এবার দু'টি ছিদ্রযুক্ত একটা ছিপি ঐ বোতলের মুখে লাগাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমন দু'টি কাচনল ছিপির ঐ ছিদ্র দু'টিতে লাগাও। কাচনল দু'টির যে মুখ বাইরে বেরিয়ে থাকবে তা যেন জেটযুক্ত অর্থাৎ ছুঁচলো ও সরু ছিদ্রযুক্ত হয়।

এইবার বোতলে জল ভর। দেখবে যে, কাচনল দু'টির মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে জল বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর বোতলটাও চক্রাকারে দিব্যি ঘুরতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

২৬

ফুটো পাত্রে জল ধরে রাখা

ঢাকনা সমেত দু'টো টিনের কৌটো যোগাড় কর। কৌটোর ঢাকনিটা বেশ শক্তভাবে এঁটে তার ঠিক মাঝ-খানটায় এমন একটা ফুটো কর, যেটাকে আঙুল দিয়ে চেপে বন্ধ করা যায়। ঐ কৌটোটারই তলার দিকে চালুনির মতো অনেকগুলো ছোট ছোট ফুটো কর।

এরপর ঢাকনা খুলে কৌটোটায় জল ভর্তি কর। তারপর

ঢাকনাটা এঁটে দাও। ঢাকনার ওপরকার ফুটোটা আঙুল দিয়ে চেপে ধর। দেখবে, কৌটোর তলার ফুটোগুলো দিয়ে একটুও জল পড়ছে না। কিন্তু ঢাকনার ওপরকার ফুটো থেকে

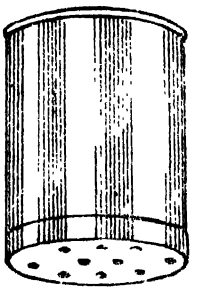

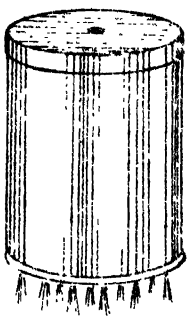

আঙুল সরিয়ে নাও। অমনি কৌটোর তলার ফুটোগুলো দিয়ে বেগে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে থাকবে।

প্রথম ক্ষেত্রে, যখন ঢাকনার ওপরকার ফুটোটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরা হয়, তখন কৌটোর ভেতরের জলের চাপের চেয়ে তলার বাতাসের চাপ বেশি হয় বলে জল পড়তে পারে না।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যখন ফুটো থেকে আঙুল সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন কৌটোর জলের ওপরে ও নীচে বাতাসের চাপ সমান হয়। ফলে কৌটোর জল তার নিজের স্বাভাবিক চাপেই ঝরে পড়তে থাকে।

২৭

রুপোর গাছ

একটা বড় ও মজবুত কাচের টেস্ট টিউব যোগাড় কর। ঐ টেস্ট টিউবের মধ্যে আধ গ্রাম সিলভার নাইট্রেট যৌগ আধ আউন্স পাতিত জলে গুলে নাও। একটা ছোট কাচ-

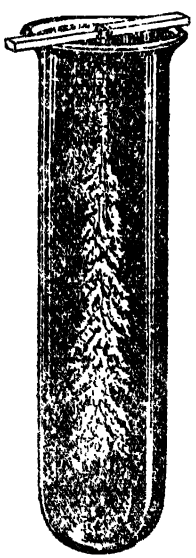

দণ্ডের মাঝখানে পরিষ্কার একখণ্ড তামার তারের একপ্রান্ত বাঁধ। ছবিতে দেখানো উপায়ে কাচদণ্ডটাকে টেস্ট টিউবের খোলা মুখের ওপর এমনভাবে রাখ, যাতে তামার তারের বেশির ভাগটা ঐ দ্রবণের মধ্যে ডুবে থাকে।

এই অবস্থায় টেস্ট টিউবটাকে নাড়াচাড়া না ক'রে বেশ কয়েক ঘণ্টা রেখে দাও। দেখবে যে, ঐ তামার তারের গায়ে রুপোর ছোট ছোট কণা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে সুন্দর একটা গাছের আকার ধারণ করেছে। ঐটাই 'রুপোর গাছ'।

২৮

বিনা আগুনে জল ফোটানো

একটা চায়ের কাপে কিছুটা ঠাণ্ডা জল রাখ। কাপের ঐ জলে অল্প অল্প ক'রে সম-আয়তনের গাঢ় 'সালফিউরিক অ্যাসিড'

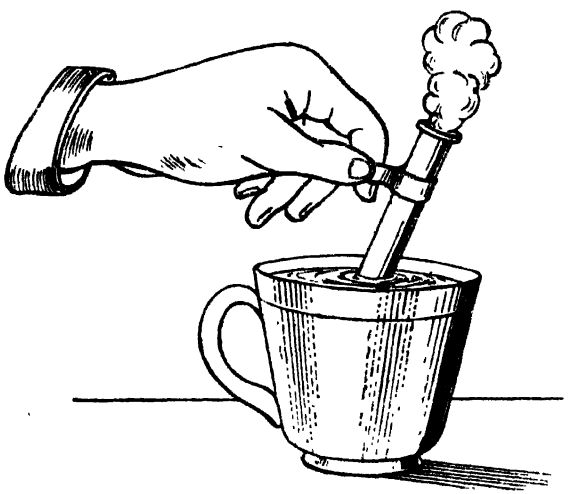

ঢাল। ঢালবার সময় একটা কাচদণ্ডের সাহায্যে দ্রবণটাকে নাড়তে থাক।

এইবার একটা টেস্ট টিউবে কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ জল নিয়ে কাপের ঐ অ্যাসিড দ্রবণে ডুবিয়ে রাখ। দেখবে যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেস্ট টিউবের মধ্যের জল ফুটতে আরম্ভ করেছে। তার মানে ঐ জলের উষ্ণতা তখন একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌছেচে।

জলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফেললে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। আর এক্ষেত্রে সেই তাপে জলটা ফুটেছে।

২৯
সাবানের বুদ্বুদের পেটে বুদ্বুদ

সাবানের বুদ্বুদ সৃষ্টি ক'রে তা ওড়ানো একটা মজাদার খেলা। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে কাঠের খাড়া দণ্ডটার গায়ে একটা পরিষ্কার তামার তার জড়িয়ে 'রিঙ' তৈরি কর। রিঙটাকে সাবান জলে ভেজাও।

সরু একটা কাচনল সাবানের জলীয় দ্রবণে ডোবাও এবং ফুঁ দিয়ে বড় আকারের একটা বুদ্বুদ সৃষ্টি কর। বুদ্বুদটিকে ঐ রিঙের ওপর রাখ। এইবার কাচনলটিকে আবার সাবান জলে ডুবিয়ে প্রথম বুদ্বুদের ভেতরে নলের আগাটা ঢুকিয়ে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বুদ্বুদ সৃষ্টি কর। তারপর সাবধানে নলটিকে টেনে বের ক'রে নাও।

যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষাটি করতে পারলে সাবানের বুদ্বুদগুলি ফাটবে না। বড় বুদ্বুদটির পেটে ছোটটি

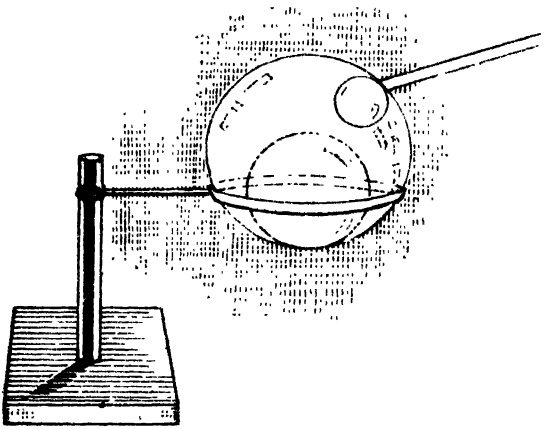

র'য়ে যাবে। একটি বুদ্বুদের গায়ে অপরটি কিন্তু লেগে থাকবে না। দু'টির মাঝে বায়ুপূর্ণ একটু ফাঁক রয়েই যাবে।

একটু অভ্যাস করলে প্রথম বুদ্বুদটির পেটে আরও একটি ছোট বুদ্বুদ তোমরা অনায়াসে ঢোকাতে পারবে।

৩০

কাগজের ঘোড়দৌড়

পাতলা, হালকা ও চৌকো দু'টুকরো কাগজ নাও। প্রত্যেকটি কাগজ সমান দু'ভাগে ভাগ ক'রে ভাঁজ কর। জোড়া অবস্থাতেই প্রত্যেকটি কাগজ কেটে একটি ক'রে কাগজের ঘোড়া তৈরি কর। ঘোড়াগুলো যেন মসৃণ তল-বিশিষ্ট একটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

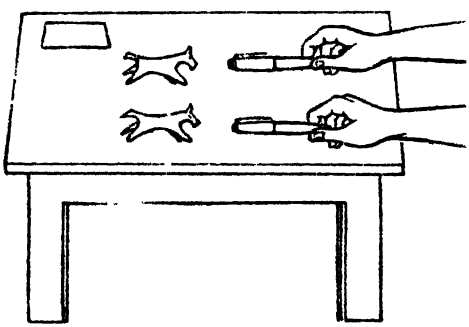

টেবিলের ওপর পাশাপাশি দু'টি ঘোড়াকে দাঁড় করাও। প্লাস্টিকের দু'টি ফাউন্টেন পেন পশমী কাপড় দিয়ে ঘষতে থাক। এই ঘর্ষণের ফলে কলম দু'টিতে ঘর্ষ-তড়িৎ বা স্থির-তড়িতের উৎপত্তি হবে। তখন এক-একটি কলম এক-একটি ঘোড়ার

সামনে ধরে পিছন পানে ধীরে ধীরে টানলে স্থির-তড়িতের আকর্ষণে ঘোড়া দু'টি সুমুখ পানে এগিয়ে যেতে থাকবে। মনে হবে যেন ঘোড়দৌড় হচ্ছে।

৩১

বুমেরাং নিক্ষেপ

বুমেরাং কি জিনিস তা জান তো? বুমেরাং হলো এক ধরনের অস্ত্র—যা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা সেকালে পাখি শিকার করতো। জিনিসটা আর কিছুই নয়, হাতলহীন দেশী লাঙ্গলের মতো বাঁকানো ও চ্যাপ্টা একখণ্ড কাঠ।

বুমেরাংয়ের বিশেষত্ব হলো, ঠিকমতো কায়দা ক'রে একে ছুঁড়তে পারলে এটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে অনেকটা দূর এগিয়ে যায়। তারপর লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত ক'রে ঘুরতে ঘুরতেই আবার নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে। বুমেরাংয়ের বাহু দু'টো সমান নয়। একটা অপরটার চেয়ে সামান্য ছোট। বুমেরাংয়ের কথা যা বললাম, বিশ্বাস না হয়তো পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমন আকারের কার্ডবোর্ডের একটা বুমেরাং তৈরি কর। এর একটা বাহু যেন

পাঁচ সেন্টিমিটার আন্দাজ লম্বা হয়। অপরটা যেন তার থেকে সামান্য ছোট হয়। চওড়ায় প্রতিটি বাহু এক সেন্টিমিটার আন্দাজ হলেই চলবে।

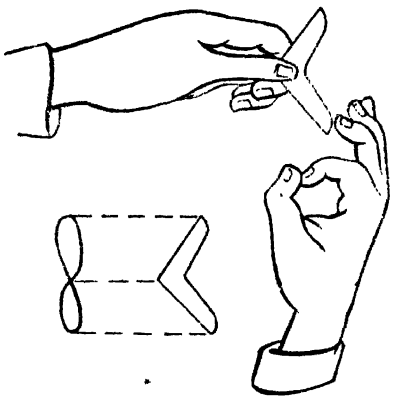

বুমেরাংটি তৈরি হলে ছবিতে দেখানো উপায়ে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধর। তারপর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে টোকা মেরে সামনের দিকে ছুড়ে দাও। দেখবে, তোমার হাতে তৈরি বুমেরাং পাঁচ মিটার আন্দাজ দূরত্ব কেমন সুন্দর-ভাবে উড়ে গেল। তারপর পাক খেয়ে আবার ফিরে এসে পড়ল তোমার পায়ের কাছে।

৩২

ঘূর্ণায়মান খেলনা

মিশর দেশের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে অতি প্রাচীনকালে 'হিরো' নামে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি স্টীমের সাহায্যে একটি ঘূর্ণায়মান খেলনা প্রস্তুত করেছিলেন। তোমরাও ইচ্ছে করলে সহজেই সেই খেলনাটি প্রস্তুত করতে পার। কি ভাবে পার, তা বলি শোন।

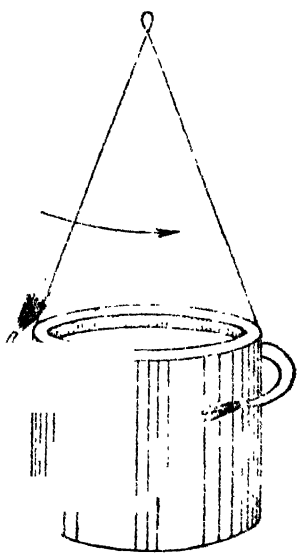

টিনের একটা বড় কৌটো যোগাড় কর। কৌটোটার গায়ের দু'পাশে দু'টি বড় বড় ছিদ্র কর। প্রত্যেকটি ছিদ্রে একটি ক'রে ছিপি লাগাও। প্রত্যেকটি ছিপির মাঝখানে একটি ক'রে ছিদ্র ক'রে তার মধ্যে ছবিতে দেখানো উপায়ে বাঁকানো কাচনল লাগাও।

কাচনলের যে মুখ বাইরে বেরিয়ে থাকবে, তা যেন জেটযুক্ত অর্থাৎ ছুঁচলো হয়।

এরপর ছিপি দু'টির সঙ্গে সুতো বেঁধে ছবিতে দেখানো উপায়ে টিনের কৌটোটাকে একটা রিঙ থেকে ঝুলিয়ে দাও। তারপর বুনসেন দীপ বা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে কৌটোর জলকে গরম করতে থাক।

জল ফুটে যখন বাষ্প হবে তখন ঐ দুই কাচনলের সরু মুখ দিয়ে তীব্রবেগে বাষ্প বেরুতে থাকবে। দেখবে যে, বাষ্প বেরুচ্ছে যে দিক থেকে, টিনের কৌটোটা ঘুরছে তার বিপরীত দিকে।

৩৩

চামচ থেকে মধুর ঘণ্টাধ্বনি

ধাতুর তৈরি একটা চায়ের চামচ নাও। সমান দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট দু'গাছা লম্বা সুতোয় গেরো বেঁধে চামচখানাকে ঝুলিয়ে দাও। সুতো দু'গাছার দু'প্রান্তে দু'টো ফাঁস তৈরি কর। ফাঁস দু'টির মধ্যে দিয়ে দু'টি আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে আঙুল দু'টির আগা কানের ছিদ্রের ওপর চেপে ধর।

এরপর তোমার বন্ধুকে বল, আর একটি ধাতব চামচের

সাহায্যে ঐ ঝুলন্ত চামচখানায় মৃদু আঘাত করতে। আঘাত করা মাত্রই তুমি মধুর ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাবে।

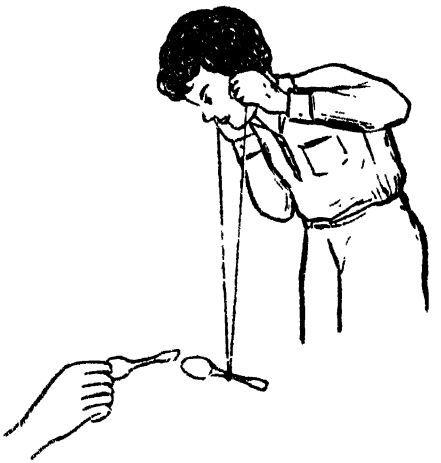

শব্দ যে সুতোর মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে—এ পরীক্ষাটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩৪

সরু গলার বোতলে ডিম ঢোকানো

এমন একটি বোতল যোগাড় কর, যার মুখটা সাধারণ একটা হাঁসের ডিমের চাইতে সামান্য ছোট। তার মানে, ডিমটা বোতলের মুখে রাখলে বোতলের মধ্যে ঢুকবে না।

ডিমটাকে এইবার গাঢ় 'ভিনিগারের' মধ্যে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ ডুবিয়ে রাখ। তাতে ক'রে ডিমটা রবারের বলের মতো নরম হয়ে যাবে। ঐ খালি বোতলটার অর্ধাংশ এইবার 'অ্যামোনিয়াম কার্বনেটের' জলীয় দ্রবণ দিয়ে পূর্ণ কর। তার পর ভিনিগার থেকে তুলে আনা ডিমটাকে বোতলের মুখে রেখে অল্প একটু চাপ দাও। দেখবে, ডিমটা বোতলের মধ্যে দিব্যি ঢুকে গেছে। ভাঙা তো দূরের কথা, ফাটেনি পর্যন্ত!

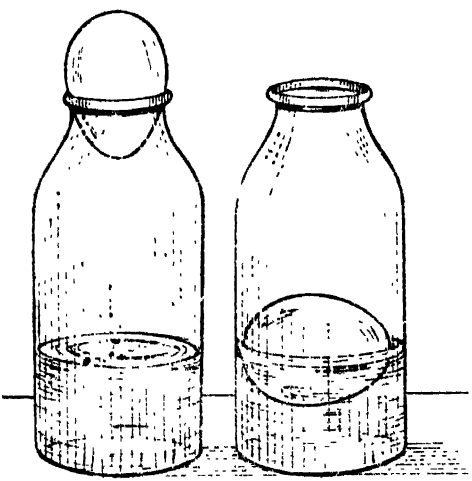

বোতলের মধ্যেকার দ্রবণে কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর ডিমটি আবার তার আগেকার আকার ফিরে পেয়েছে। বোতল থেকে তখন আর সেটাকে কিন্তু বের করতে পারবে না।

৩৫

তরলে ভাসমান ডিম

বড় একটা কাচের গ্লাস নাও। গ্লাসটার বেশির ভাগ অংশ লঘু 'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড' দিয়ে পূর্ণ কর। তারপর একটি হাঁসের ডিম ধীরে ধীরে ঐ গ্লাসের অ্যাসিডে ফেলে দাও।

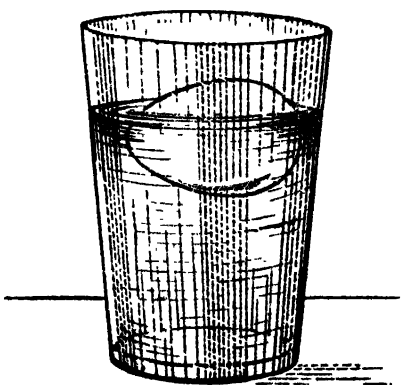

দেখবে, ডিমটি গ্লাসের নীচে নেমে গেল। সেখানে কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। আস্তে আস্তে ডিমটি আবার তরলের ওপরে উঠে এল।

কিন্তু কেন ?

কারণ, ডিমের ওপরকার খোলার প্রধান উপাদান হলো 'খড়িমাটি' অর্থাৎ 'ক্যালসিয়াম কার্বনেট'। এই খড়িমাটির সঙ্গে গ্লাসের অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হলো 'কার্বন ডাই-অক্সাইড' গ্যাস। লক্ষ্য করলেই দেখবে যে, ছোট্ট ছোট্ট গ্যাসের বুদ্বুদ তখন ডিমের গোটা গায়ে লেগে ছিল। ডিমের ভাসনের জন্যে দায়ী ঐ গ্যাসের বুদ্বুদগুলোই।

৩৬

জলে চলমান দেশলাই কাঠি

কলাই করা একটা বড় গামলা যোগাড় কর। সেটায় জল ভর্তি ক'রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই জলটা স্থির হবে। মানে, তাতে কোনো ঢেউ থাকবে না। তখন ঐ জলের মাঝখানটায় ধীরে ধীরে একটা দেশলাইয়ের কাঠি রেখে দাও। কাঠিটা ভাসতে থাকবে।

এরপর একটা চৌকো চিনির ঢেলা সুতোয় বেঁধে দেশলাই কাঠির মাঝামাঝি অংশ থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে জলের মাঝে আংশিক ডুবিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান!—ঐ সময় জল যেন বেশি আলোড়িত না হয়।

ডোবার পর কি দেখবে ?

দেখবে যে, চিনির ঢেলাটার দিকে দেশলাই কাঠিটা এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু কেন?

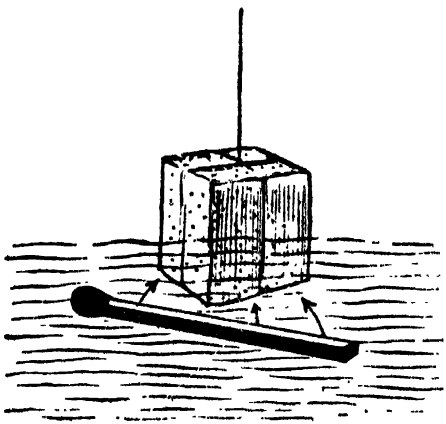

কারণ, কিছুটা চিনি জলে গোলার দরুণ চিনির জলীয় দ্রবণ উৎপন্ন হয়। ঐ দ্রবণ পাত্রের জলের চাইতে ভারী বলে জলের নীচে খানিকটা নেমে যায়। তার জায়গায় রেখে যায় খানিকটা শূন্যস্থান। ঐ শূন্যস্থান সৃষ্টি হওয়ামাত্রই চার-পাশের জল শূন্যস্থানের দিকে ছুটে যায়। ছুটে যাবার সময় দেশলাই কাঠিটাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। তাই তখন আমরা দেশলাই কাঠিটাকে চলতে দেখি।

৩৭

ঘরের মাঝে রামধনু

দিনের বেলায় যখন প্রখর সূর্য-কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত, তখন একটা ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দাও। ঘরের জানালার কাচের শার্সিতে বাদামী রঙের কাগজ লেপটে

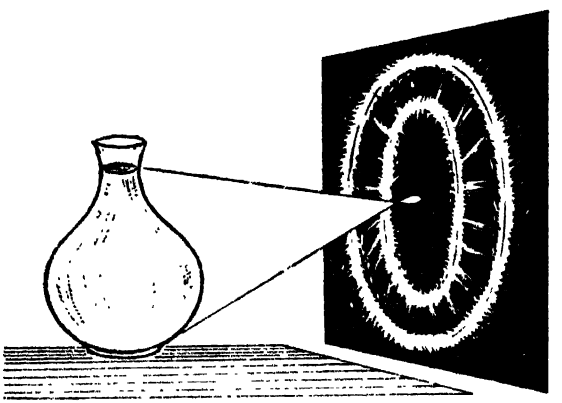

দাও আঠা দিয়ে। এক কথায়, ঘরটাকে সম্পূর্ণরূপে আলোক-নিরুদ্ধ কর।

এরপর একটি আলপিনের সাহায্যে কাচের শার্সির ওপর

লেপটানো কাগজের মাঝে ছোট্ট একটা ফুটো কর। তাহলে ঐ ফুটোর মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি অন্ধকার ঘরে ঢুকবে। এখন ঘরের মধ্যে ঐ আলোক রশ্মির গতিপথে জলভরা গোলাকার একটা কাচের বোতল রাখ।

দেখবে যে, আলোক রশ্মি ঐ বোতলের গায়ে পড়ে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হ'য়ে গিয়ে পড়েছে শার্সির গায়ের বাদামী কাগজটার ওপর। সেখানে পৌঁছে আলোক রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি করেছে সুন্দর সাতরঙা একটি 'পূর্ণ রামধনু'।

৩৮

লেবু থেকে বিদ্যুৎ

সাধারণ একটা পাতি বা কাগাজ লেবু থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়, যেমন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় ব্যাটারিতে। বিশ্বাস না হয় তো পরীক্ষা ক'রে দেখ।

একটা আস্ত লেবু নাও। টেবিলের ওপরে সেটাকে রেখে গড়িয়ে গড়িয়ে চাপ দাও। তাতে ক'রে লেবুর ভিতরের কিছু কোয়া ফেটে যাবে এবং রস ক্ষরিত হবে।

এই অবস্থায় ধারালো আগাযুক্ত একটা তামার প্লেট এবং একটা দস্তার প্লেট ঐ লেবুটার ওপর পাশাপাশি রেখে গেঁথে

দাও। এই দণ্ড দু'টো যেন কোনোক্রমেই পরস্পরকে স্পর্শ না করে।

এইবার সরু তামার তারের সাহায্যে একটা গ্যালভ্যানো-মিটার যন্ত্রের দুই প্রান্তের সঙ্গে ঐ দণ্ড দু'টো যুক্ত ক'রে দাও।

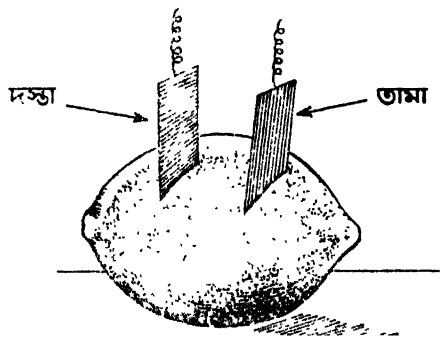

তামার দণ্ডটার সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারের পজিটিভ প্রান্ত এবং জিঙ্ক দণ্ডটার সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারের নেগেটিভ প্রান্ত যুক্ত কর। দেখবে যে, গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রের কাঁটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তার মানে ঐ যন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু এ বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে?

—এসেছে ঐ লেবু থেকেই।

এই বিদ্যুতের শক্তি কিন্তু খুবই কম। এ দিয়ে কোনো বাতি জ্বালাতে পারবে না বা এর সাহায্যে কোনো যন্ত্রও চালাতে পারবে না।

৩৯

সহজে কোল গ্যাস উৎপাদন

কয়লা থেকে যে জ্বালানী গ্যাস পাওয়া যায়, তারই নাম 'কোল গ্যাস'। রসায়নাগারে বুনসেন দীপ সাধারণতঃ এই গ্যাসের সাহায্যেই জ্বালানো হয়। ঘরে বসে সহজেই তোমরা কোল গ্যাস উৎপাদন করতে পার। কি ভাবে করতে পার, তাই শোনো।

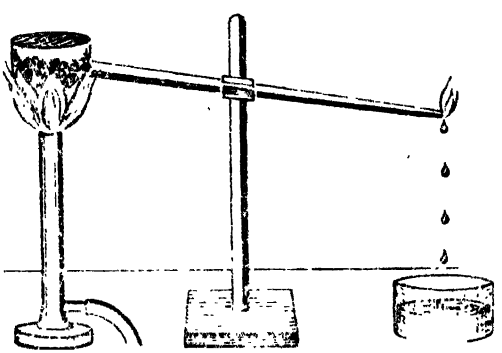

চীনামাটির তৈরি সরু ও লম্বা নলযুক্ত একটা ছোট বাটি যোগাড় কর। সাধারণ মাটি দিয়ে গড়ে পুড়িয়ে নিয়েও অমন বাটি তৈরি ক'রে নিতে পার।

ছবিতে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে নল সমেত বাটিটাকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধনীর সাহায্যে উঁচু ক'রে আটকে রাখ। বাটির মধ্যে কয়লার ছোট ছোট টুকরো ভ'রে তার মুখটা নরম এঁটেল মাটি দিয়ে বন্ধ ক'রে দাও। তারপর বাটিটায় তাপ দিতে থাক।

কিছুক্ষণ বাদে দেখবে যে, নলের মুখ দিয়ে এক রকম কালো তৈলাক্ত পদার্থ বেরিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে নীচের পাত্রে পড়ছে। সেই সঙ্গে একটা গ্যাসও বেরুচ্ছে ঐ নলের মুখ দিয়ে। নলের মুখে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধর। দেখবে যে, নলের মুখে ঐ গ্যাসটা অনুজ্জ্বল শিখায় জ্বলছে। ঐ গ্যাসই 'কোল গ্যাস'। আর পাত্রে যে তৈলাক্ত তরল জমেছে, তার নীচেকার স্তরে রয়েছে কালো রঙের আঠালো পদার্থ 'আলকাতরা'।

কোল-গ্যাসকে বিশুদ্ধ ক'রে নিলে তা বেশ উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে। এ পরীক্ষায় বিশুদ্ধ করার সুযোগ নেই বলে গ্যাসটা অনুজ্জ্বল শিখায় জ্বলেছে।

৪০

সূর্যালোকও কাজ করতে পারে

একটা দুধের বোতল নাও। খালি বোতল হলেই চলবে। গোটা বোতলটার গায়ে প্রদীপের ভুসা কালি ভালোভাবে মাখিয়ে নাও। বোতলের মুখে একটি ছিপি আটকাও। ঐ ছিপির মাঝখানে একটি ফুটো ক'রে তাতে একটা ছোট ও সোজা কাচনল লাগাও। কাচনলটির যে মুখটি বোতলের বাইরে আছে সেই মুখে ছোট ও পাতলা রবারের একটা বেলুন কয়েকবার ফুলিয়ে নরম ক'রে নিয়ে আটকে দাও। এমনভাবে আটকাও, যাতে ক'রে বেলুন ও কাচনলের সংযোগ স্থলটি বায়ু-নিরুদ্ধ হয়। বায়ু-নিরুদ্ধ করার সবচেয়ে ভালো উপায়—কাচনলের সঙ্গে বেলুনের মুখটি লাগিয়ে সুতো দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দেওয়া।

এই অবস্থায় বেলুন সমেত বোতলটাকে প্রখর সূর্যের আলোয় রেখে দাও। ছবিতে দেখানো অবস্থায় চোপসানো বেলুনটি তখন বোতলের মুখে ঝুলে থাকবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখবে যে, বেলুনটা ফুলে উঠে বোতলের মুখে খাড়া-ভাবে দাঁড়িয়েছে।

কি ক'রে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হলো, তা বলি, শোনো তবে।

কালো জিনিসমাত্রেই সূর্যের আলোর অন্তর্গত তাপকে

বেশি মাত্রায় শোষণ করে। এ ক্ষেত্রে কালো বলে বোতলটাও তাই তাপ শোষণ ক'রে তেতে উঠেছে। তখন বোতলের

ভেতরের বাতাসও তেতে হালকা হ'য়ে ওপর দিকে উঠে বেলুনটাকে ফুলিয়ে দিয়েছে। আর বেলুনটাও ফুলে ওঠার দরুন খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

৪১

যান্ত্রিক কৌশলে জল ঢালা

মনে কর—টেবিলের ওপরে একটা পাত্রে জল আছে। তোমাকে বলা হলো, পাত্রটাকে কাৎ না করে, টেবিলের নীচে রাখা একটা খালি পাত্রে জল ঢাল। টেবিলের ওপরে রাখা পাত্রটার তলায় কোনো ফুটো নেই। আবার হাত ডুবিয়ে আর কোনো পাত্রের সাহায্যে ওর থেকে জল তুলে নেওয়াও চলবে না। এ ক্ষেত্রে জল ঢালার জন্যে কি করবে তুমি?

কি করবে, তা আমিই বলে দিচ্ছি। ছবিতে যেমনটি দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি একটি বাঁকা কাচনল নেবে। কাচনলটার ছোট বাহুটা রাখবে পাত্রের জলের মধ্যে ডুবিয়ে। তারপর— বড় বাহুটার প্রান্তে মুখ লাগিয়ে খানিকটা বাতাস টেনে নেবে।

যখন দেখবে, বাতাস টানার ফলে জল নলটার বক্রকোণ পর্যন্ত এসেছে, তখনই বাতাস টানা বন্ধ ক'রে, নলটার অপর প্রান্তকে খালি পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দেবে। দেখবে, জল

কাচনল বেয়ে অবিরাম ঝরে পড়ছে নীচের খালি পাত্রে। এইভাবে ওপরকার পাত্রের সব জলটুকুই নীচের পাত্রে এসে জমবে।

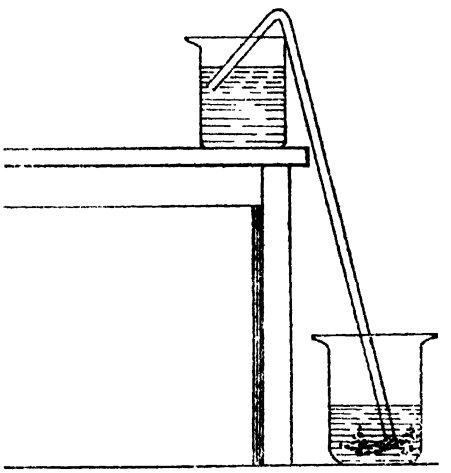

এই যে যান্ত্রিক কৌশল—যার সাহায্যে এক পাত্র থেকে অপর পাত্রে তুমি জল ঢেলে নিলে—এরই নাম 'সাইফনিং'।

৪২

তরল বায়ুর বিচিত্র ধর্ম

বায়ু কি কখনও তরল হয় ?

হ্যাঁ, হয় বৈ কি ?

অনেক গ্যাসকে যেমন শীতল ক'রে তরলে পরিণত করা যায়, তেমনি বায়ুকেও কৌশলে তরলে পরিণত করা যায়। বায়ুকে তরলে পরিণত করার কৌশল আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি চাই তরল বায়ুর দু'টি বিচিত্র ধর্মের উল্লেখ করতে। পরীক্ষা ক'রে এ ধর্ম দু'টির সত্যতা তোমরা যাচাই ক'রে নিতে পার।

কোনো বড় গ্যাস কোম্পানী থেকে এক লিটার তরল বায়ু কিনে আন। কিন্তু পরীক্ষা করার সময় সাবধান থেকো। গায়ের কোথাও যেন তরল বায়ু না লাগে। লাগলে সে জায়গাটা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাবে, শক্ত ও বিবর্ণ হ'য়ে যাবে।

একটা কাচের ফ্লাস্কে তরল বায়ু নিয়ে রিঙের সাহায্যে সেটাকে একটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকাও। তারপর একটা জ্যান্ত কৈ মাছ সুতোয় বেঁধে ফ্লাস্কের তরল বায়ুর মধ্যে ডুবিয়ে

দাও। লক্ষ্য কর, ছ্যাঁক ক'রে একটা শব্দ হলো—যেমন শব্দ হয় তপ্ত তেলে মাছ ছাড়ার সময়।

মিনিটখানেক বাদে ঐ সুতোর সাহায্যেই মাছটাকে ফ্লাস্ক থেকে তুলে আন। এবার দেখবে যে, ওটা চীনামাটির মতো

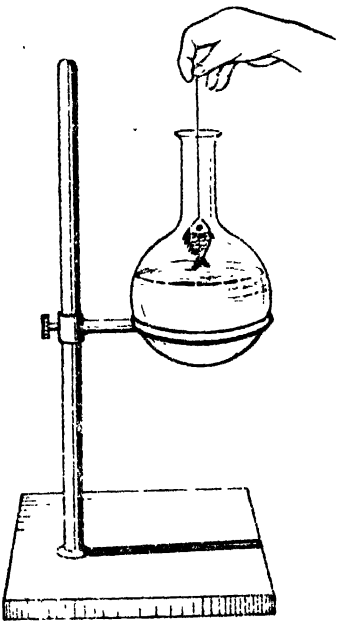

সাদা, শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে গেছে। মাছটাকে তারপর মাটিতে রেখে ঘা দাও। ওটা চীনামাটির জিনিসের মতোই ভেঙে যাবে। শুধু মাছ নয়—যে কোনো নরম জিনিসই তরল বায়ুতে ডোবালে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাবে।

এবারে আর একটা পরীক্ষার কথা বলি

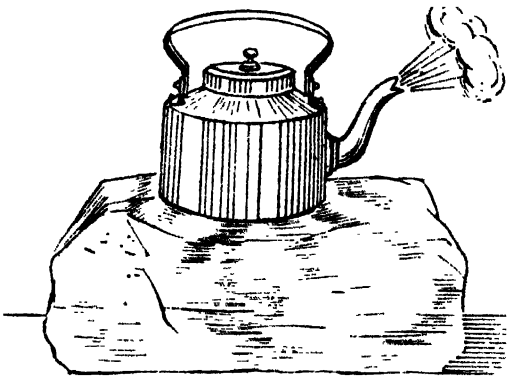

একটা কেট্‌লিতে তরল বায়ু রেখে কেট্‌লিটাকে একটা বরফের চাঙড়ের ওপর বসিয়ে দাও। উনুনের ওপর কেট্‌লিতে জল যেমন ফোটে, বরফের ওপর তরল বায়ুও তেমনি ফুটতে আরম্ভ করবে। এর কারণ কি জান?

কারণ, তরল বায়ু এত বেশি ঠাণ্ডা যে তার তুলনায় বরফ আগুনের মতোই গরম।

শিখা নেই, এমন একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি তরল বায়ুর মধ্যে ডোবাও। দেখবে যে, কাঠিটা দপ করে জোর শিখায় জ্বলে উঠেছে।

৪৩

তারের সাহায্যে বরফ কাটা

স্ট্যাণ্ডের গায়ে একটা রিঙ আটকাও। ঐ রিঙের ওপর একটা বরফের চাঙড় রাখ। একটা সরু তামার তার ঐ বরফ খণ্ডের ওপর ঝুলিয়ে তারের দুই প্রান্ত প্যাঁচ দিয়ে জোড়া লাগাও। তারপর ঐ জোড়া লাগানো অংশ থেকে একটা ভারী ওজন ঝুলিয়ে দাও।

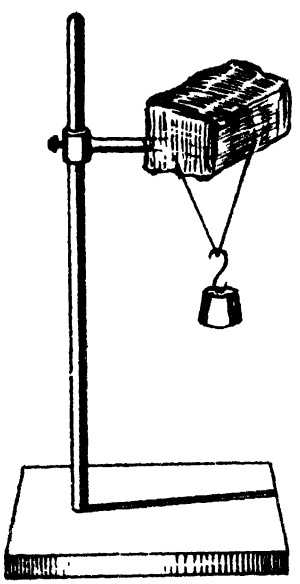

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখবে যে, ওজনসহ তারটি বরফ কেটে নীচে নেমে এল, কিন্তু বরফের চাঙড়টা অবিভক্তই রয়ে গেল।

ভারী মজার ব্যাপার নয় কি?

এটা কি ক'রে সম্ভব হলো বল দেখি?

তারটি সরু হওয়ায় এবং ওজন ঝুলিয়ে দেওয়ায় তারের নীচে বরফের ওপর বেশ চাপ পড়ে। সেই চাপে বরফের সেই জায়গার গলনাঙ্ক কমে যায় এবং বরফ গলে জল হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ জলের নীচে চলে আসে। ঐ জল তখন তারের ওপরে উঠে যায়। জলটুকুর ওপর চাপ কমে যাওয়ায় তার গলনাঙ্ক বেড়ে শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়। সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলা জল জমে আবার বরফ সৃষ্টি করে।

এইভাবে আস্তে আস্তে তারটি বরফ কেটে বেরিয়ে যায় অথচ বরফখণ্ড দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় না। কারণ, নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরের জল জমাট বেঁধে যায়।

৪৪

কম উষ্ণতায় জল ফোটানো

বিশুদ্ধ জল একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ফোটে, তা তোমরা হয়তো জান। কিন্তু কৌশলে সেই জলকে ওর থেকে কম উষ্ণতায় ফোটানো যায়। কি ভাবে যায়, তা বলি শোনো।

গোল তলাযুক্ত একটা কাচের ফ্লাস্ক নাও। ফ্লাস্কটির অর্ধাংশ জল দিয়ে ভর্তি কর। তারপর ফ্লাস্কটি আগুনের শিখার ওপর বসিয়ে জলকে ফোটাও। জল হতে উৎপন্ন বাষ্প তখন ফ্লাস্ক থেকে সমস্ত বাতাসকে বের ক'রে দেবে।

এইবার একটা কর্ক দিয়ে ফ্লাস্কের মুখটা বন্ধ কর ; কর্কের মুখের ফুটো দিয়ে একটা থার্মোমিটার ঢোকাও। ফ্লাস্কে উত্তাপ দেওয়া বন্ধ কর। ছবিতে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ফ্লাস্কটিকে একটি ত্রিপদ স্ট্যাণ্ডের ওপর উল্টো

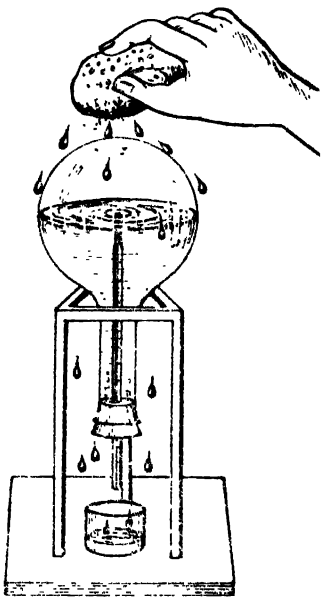

ক'রে বসাও। তখন জলের ওপরকার জায়গাটুকু জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকবে। আবার আগুন থেকে সরিয়ে নেওয়ার ফলে জলের ফুটনও বন্ধ হবে।

এই অবস্থায় এক টুকরো স্পঞ্জ ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে ফ্লাস্কের

ওপর ধর এবং চাপতে থাক। ঠাণ্ডা জলের ধারা ফ্লাস্কের ওপর পড়ার পরেই দেখবে যে, ভেতরের জল আবার ফুটতে শুরু করেছে। এই ফুটন কিন্তু একটু পরেই থেমে যাবে। আবার ঠাণ্ডা জলের ধারা ফ্লাস্কের ওপর ছড়িয়ে দাও। জল আবার ফুটতে থাকবে। ঐ সময় থার্মোমিটারের পাঠ দেখ। দেখবে, উষ্ণতা একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়েও কয়েক ডিগ্রী কম।

কি ক'রে এটা সম্ভব হলো, শোনো তাহলে। ঠাণ্ডা জল ঢালার দরুন ফ্লাস্কের মধ্যেকার জলীয় বাষ্পের কিছু অংশ তরলে পরিণত হলো। তখন জলের ওপরের চাপ অনেক কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলের ফুটনাঙ্কও কমে গেল। ফলে একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কম উষ্ণতাতেই জল ফুটতে লাগল।

৪৫

আগুনের শিখা ও তারের জাল

এবার যে পরীক্ষাটার কথা বলব—তার জন্যে বুনসেন দীপ চাই। বুনসেন দীপ তো ঘরে পাবে না। তাই তোমাকে যেতে হবে পরীক্ষাগারে।

স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে একটা রিঙ আটকিয়ে তার ওপর একটা তামার তারের জাল রাখ। এখন একটা জ্বলন্ত বুনসেন দীপকে

ঐ তারের জালের নীচে এমনভাবে রাখ, যেন তারের জাল শিখাটিকে চাপা দেয়।

লক্ষ্য কর, শিখাটি জাল ভেদ ক'রে ওপরে উঠতে পারেনি। জালের নীচেই জ্বলছে। এর কারণ কি ?

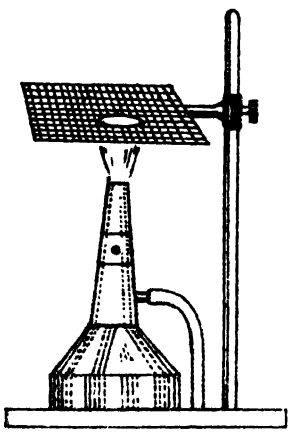

কারণ আর কিছুই নয়, কারণ হচ্ছে—তামা তাপের সুপরিবাহী। শিখা জালের সংস্পর্শে আসামাত্রই জাল চারদিকে শিখার তাপটা ছড়িয়ে দেয়। ফলে জালের ওপরের গ্যাস গরম হয়ে জ্বলন বিন্দুতে পৌঁছুতে পারে না। সেই কারণে জালের ওপরে শিখাও জ্বলতে পারে না।

এইবার বুনসেন দীপকে নিভিয়ে তার কিছু ওপরে জালটি রাখ এবং বুনসেন দীপের গ্যাস খুলে দাও। গ্যাস জাল ভেদ

ক'রে ওপরে উঠে যাবে। ওপরের গ্যাসে আগুন ধরিয়ে দাও। জালের ওপরে আগুনের শিখা জ্বলতে থাকবে—নীচে শিখা প্রসারিত হবে না।

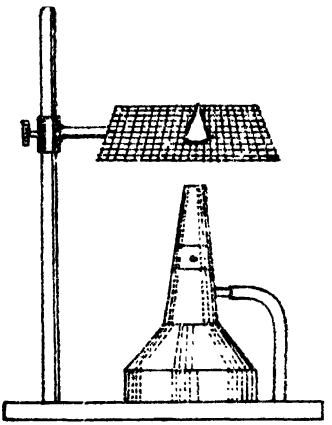

কারণ সেই একই।

তামার তারের জাল চারদিকে তাপ ছড়িয়ে দেওয়াতে জালের তলার গ্যাস জ্বলন বিন্দুতে পৌঁছুতে পারেনি। ফলে জালের নীচে শিখাও জ্বলেনি।

৪৬

যে রঙ উবে যায়

একটা খালি কাচের বোতল নাও। তাতে খানিকটা জল ঢাল। সেই জলে অল্প 'ফেনপ্‌থ্যালিন'-এর গুঁড়ো ফেলে ছিপি বন্ধ ক'রে বোতলটাকে ঝাঁকাও। দেখবে যে, বোতলের জলটা ঘোলাটে হয়ে গেল।

এইবার ঐ ঘোলাটে জলে কিছুটা 'লাইকার অ্যামোনিয়া' ঢাল। 'লাইকার অ্যামোনিয়া' হলো অ্যামোনিয়া গ্যাসের গাঢ় জলীয় দ্রবণ। এটা ফেনপ্‌থ্যালিন মেশানো জলে ঢালা-মাত্রই জলটা টকটকে লাল রঙের হয়ে যাবে।

ঐ লাল রঙ তোমার বন্ধুর সাদা জামায় ছিটিয়ে দাও। অমন সুন্দর ধবধবে সাদা জামাটায় রঙ লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে বন্ধুও তোমার ওপর রেগে লাল হয়ে যাবে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, জামার ঐ রঙটা আস্তে আস্তে উবে যেতে থাকবে। কয়েক মিনিট বাদে সব রঙটুকু উবে গিয়ে বন্ধুর জামাটা আবার ধবধবে সাদা হয়ে যাবে। বন্ধুর মনও তখন খুশিতে ভরে উঠবে।

এখন শোনো কি ক'রে রঙটা অদৃশ্য হয়। লাইকার

অ্যামোনিয়া হচ্ছে ক্ষার পদার্থ। ফেনপ্‌থ্যালিন ক্ষারের সংস্পর্শে এলে লাল হয়ে যায়। পরীক্ষায় লাল রং উৎপত্তির কারণ এইটাই।

খোলা বাতাসে রাখলে 'লাইকার অ্যামোনিয়া'র জলীয় দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। তার ফলে লাল রঙও অদৃশ্য হয়ে যায়। জামা থেকে লাল রঙ উবে গেলে জামায় পড়ে থাকে ফেনপ্‌থ্যালিনের একটুখানি সাদা গুঁড়ো।

৪৭

ফুটন্ত জলেও বরফ গলে না

একটা টেস্ট টিউব নাও। সেটাকে জল দিয়ে ভর। ঐ জলে এক টুকরো বরফ ফেলে দাও। জলের চাইতে বরফ হালকা বলে ঐ বরফের টুকরোটা ভেসে উঠতে পারে। যাতে ভেসে না ওঠে, সেজন্যে ঐ বরফের ওপর এক টুকরো নুড়ি পাথর চাপা দাও।

এইবার ছবিতে দেখানো পদ্ধতিতে একটা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে ঐ টেস্ট টিউবের ওপরকার অংশেই শুধু তাপ দাও। দেখবে, জল ফুটতে আরম্ভ করেছে ও স্টীম বেরুচ্ছে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, টেস্ট টিউবের বরফ গলছে না একটুও।

এর কারণ কি জান ?

কারণ, জল তাপের কুপরিবাহী।

তাপ পেয়ে টেস্ট টিউবের ওপরকার অংশের জল ফুটছে বটে, কিন্তু ফুটন্ত জলের তাপ নীচে নেমে আসছে না। কারণ জল গরম হলে আয়তনে বাড়ে ও হালকা হয়। হালকা

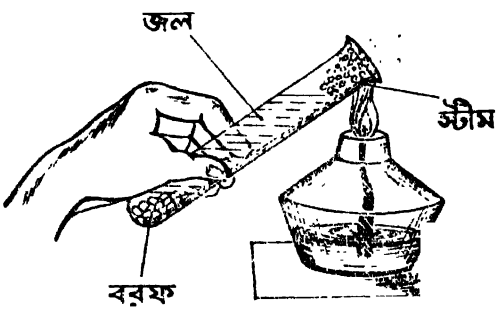

হওয়ার দরুন গরম জল নীচে নেমে আসে না। বরং আরও ওপরে উঠে যায়। তাই নীচের জল বরাবর ঠাণ্ডাই রয়ে যায়। ফলে বরফও গলে না।

৪৮

জলের ফোয়ারা

একটা গোলতলবিশিষ্ট ফ্লাস্ক যোগাড় কর। অল্পক্ষণ রোদে ফেলে রেখে ফ্লাস্কটিকে শুকিয়ে নাও। তার ভেতরে যেন একটুও জল লেগে না থাকে। রসায়নাগারে গিয়ে ফ্লাস্কটিতে 'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস' ভর। কর্ক দিয়ে ফ্লাস্কের মুখটি বন্ধ ক'রে দাও এবং স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে লাগানো রিঙের ওপরে সেটাকে উপুড় ক'রে বসাও। কর্কের মুখে একটা ফুটো ক'রে, ছুঁচলো আগাবিশিষ্ট একটা লম্বা কাচনল ফ্লাস্কের মধ্যে ঢোকাও।

কাচনলের ছুঁচলো প্রান্তটি যেন ফ্লাস্কের মধ্যে থাকে। আর মোটা প্রান্তটি যেন থাকে ফ্লাস্কের নীচে রাখা জলভরা একটা বাটির মধ্যে। বাটির জলে একটু নীল লিটমাস দ্রবণ মেশাও। জলটা নীল হয়ে যাবে। তারপর অল্প পরিমাণ বরফ জলে ভেজানো ন্যাকড়ার সাহায্যে ফ্লাস্কটিকে ঠাণ্ডা কর।

ঠাণ্ডা করার ফলে ফ্লাস্কের মধ্যেকার গ্যাস আয়তনে সামান্য সংকুচিত হবে। তার ফলে নীচের বাটির কয়েকফোঁটা জল গ্যাস ভরা ফ্লাস্কে ঢুকে পড়বে। ঐটুকু জলে খানিকটা

গ্যাস দ্রবীভূত হবে। তখন ফ্লাস্কের মধ্যে গ্যাসের চাপ কমে যাবে। আর বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপে বাটির জল ঐ কাচ-নল বেয়ে নলের ছুঁচলো প্রান্ত দিয়ে ফ্লাস্কের মধ্যে ফোয়ারার

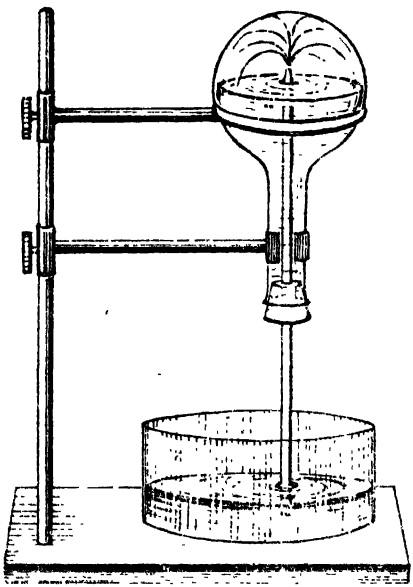

আকারে ঝরে পড়বে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, বাটির লিটমাস গোলা নীল জল গ্যাসভরা ফ্লাস্কে ঢুকে লাল হয়ে যাচ্ছে।

এর কারণ, ঐ গ্যাসটা অ্যাসিডধর্মী। আর অ্যাসিডধর্মী গ্যাসের সংস্পর্শে নীল লিটমাস দ্রবণ লাল হয়ে যায়।

৪৯

ঘূর্ণায়মান কাগজের স্ক্রু

একটা বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্প যোগাড় কর। আর একটা

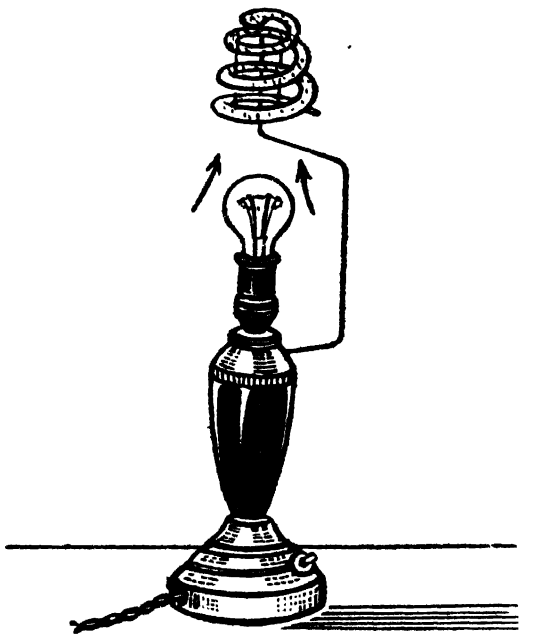

মোটা কাগজ কেটে স্ক্রুর মতো একটা পেঁচানো জিনিস

তৈরি কর। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে কাগজের স্ক্রুটাকে তারের সাহায্যে ঐ টেবিল ল্যাম্পের মাথার ওপরে বসাও। স্ক্রুটাকে তারের ডগায় এমনভাবে আটকাও, যাতে ক'রে ওটা তারকে অক্ষরূপে ব্যবহার ক'রে সহজেই ঘুরপাক খেতে পারে।

এইবার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দাও। বাল্বের ওপরকার বাতাস ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠবে এবং হালকা হয়ে ওপর দিকে চলে যাবে। চলে যাবে স্ক্রুর প্যাঁচগুলির ফাঁক দিয়ে—তীর-চিহ্নিত পথে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাল্বের মাথার ওপরের স্থান বায়ুশূন্য হয়ে পড়বে। তখনি চারপাশের ভারী বাতাস ঐ শূন্যস্থান পূরণের জন্যে ছুটে আসবে।

গরম ও হালকা বাতাস ছুটে যাচ্ছে ওপরে। নীচে নেমে আসছে ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস। এই দু'রকম বাতাসের ছোটাছুটির ধাক্কায় কাগজের স্ক্রুটা তখন তীর-চিহ্নিত দিকে দিব্যি ঘুরপাক খেতে আরম্ভ ক'রে দেবে। বাতিটা নিভিয়ে দিলে ওর ঘোরাও যাবে বন্ধ হয়ে।

৫০

ডুবুরী পুতুল

প্লাস্টিকের পুতুল যারা তৈরি করে, তাদের কাছে ফরমাশ দিয়ে ছোট্ট একটা পুতুল তৈরি করিয়ে নাও। পুতুলটি ফাঁপা হবে। তার একটি লেজও থাকবে। লেজের শেষ প্রান্ত-টিতে থাকবে ফুটো, যাতে ক'রে ঐ ফুটো দিয়ে জল ও বাতাস পুতুলের মধ্যে ঢুকতে পারে। ঐ পুতুলটি ছাড়াও যোগাড় কর একটি কাচের চোঙ এবং পাতলা এক টুকরো রবার।

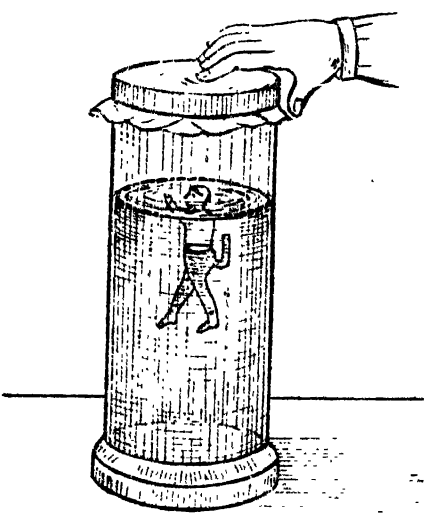

পুতুলের ভেতরে খানিকটা জল ভর। পুতুলের বাকি অংশটা বাতাস ভরা থাকবে। সাধারণ অবস্থায় ঐ জলভরা

পুতুলটির ওজন এমন হওয়া চাই, যাতে ক'রে আংশিক ডোবা অবস্থায় ওটা জলে খাড়াভাবে ভাসে।

কাচের চোঙটার তিন ভাগের দু'ভাগ জল দিয়ে ভর। পুতুলটাকে জলে ছেড়ে দাও। আংশিক ডোবা অবস্থায় পুতুলটা তখন খাড়াভাবে জলে ভাসতে থাকবে। এইবার কাচের চোঙের মুখে রবারের পাতলা চাদরটা টান ক'রে সুতো দিতে বাঁধ।

রবারের চাদরটাকে এবার হাত দিয়ে চাপ। ঐ চাপে চোঙের জলের ওপরকার বায়ু সংকুচিত হবে এবং খানিকটা জল পুতুলের ভেতরে ঢুকে পড়ে সেটাকে ভারী ক'রে দেবে। পুতুল তখন জলে ডুবে যাবে।

এরপর রবারের চাদরের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নাও। হাত সরিয়ে নেওয়া মানে এক্ষেত্রে চাপ সরিয়ে নেওয়া। চাপ সরিয়ে নেওয়ার দরুন চোঙের মধ্যে সব জায়গায় বায়ুর চাপ কমে যাবে। তখন পুতুলের ভেতরকার বায়ু স্থিতিস্থাপকতার জন্যে আয়তনে বাড়বে এবং পুতুল থেকে অতিরিক্ত জল বের ক'রে দেবে। হালকা হওয়ায় পুতুলটা তখন জলের ওপর ভেসে উঠবে।

এমনিভাবে যখনই তুমি রবারের চাদরে চাপ দেবে, তখনই পুতুলটি জলে ডুব দেবে। আর চাপ ছেড়ে দিলেই পুতুল ভেসে উঠবে। আবার চাপ নিয়ন্ত্রণ ক'রে পুতুলকে জলের ভেতরে যে কোনো জায়গায় স্থিরভাবে রাখতেও পারবে।

সমাপ্ত